মতিয়া



(উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন,

বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

মাঘ, ১৩৩৭

মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

প্রকাশক—
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ও ময়মনসিংহ।

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত
বঙ্গলক্ষ্মী প্রেস,
জামালপুর, ময়মনসিংহ।

উপহার।

এই ....

....

শ্রী ....

উপহার দিলাম।

ঘরের কথা।

এই উপন্যাসখানা, ইতিপূর্ব্বে, অভিশপ্ত নামে, মাসিক পত্রিকায়, বাহির হইয়াছিল। অভিশপ্ত নামীয় উপন্যাস, বিবাহে উপহার দিতে অনেকেই নারাজ। তাই, সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুরোধে, নাম পরিবর্ত্তন করিয়া,—মতিয়া,—নামে প্রকাশ করিলাম।

তিনটি স্বর্গীয় কুসুম-সম্ভারে, এই ক্ষুদ্র মালা রচনা করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে, ভাগ্যক্রমে যদি ইহা সুধী সমাজে লাভ করিতে সক্ষম হয়,—তবেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

● যে সকল সহৃদয় বন্ধুবর্গের উদ্যোগে ও যত্নে, পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছি,—তাঁহাদিগকে আমার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের এই শুভ সুযোগ গ্রহণ করিলাম। অলমতিবিস্তরেণ

শ্রীপঞ্চমী, মাঘ
১৩৩৭
পূর্ব্ব-সিমুলিয়া, ঢাকা।

শ্রীসুরেন্দ্র

উৎসর্গ।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য—

রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, বাহাদুর

এম, এ, এম, আর, এ, এস্।

ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল,

মহাশয়ের করকমলে

ঐকান্তিক শ্রদ্ধার নিদর্শন

স্বরূপ,—উৎসর্গ

করিলাম।

মাঘ, ১৩৩৭

পূর্ব্ব-সিমুলিয়া, ঢাকা।

শ্রীসুরেন্দ্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন
প্রণীত—

১। অনিমা—(কবিতা পুস্তক) ৷৵০

২। ত্র্যহস্পর্শ—(উপন্যাস) ১।০

প্রবাসী বলেন,—(আশ্বিন ১৩৩৪) ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা করিয়া, গ্রন্থের নায়ক ননীবাবু, কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পত্নী উষার সহিত—তাঁহার বিচ্ছেদ ও পরে সমুদ্রতীরে শোভার সহিত প্রণয় ঘটিয়া, তাঁহাকে যে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল; এই উপন্যাসে তাহা চমৎকার ফুটিয়াছে। উপন্যাসটির পরিকল্পনা সুন্দর। গ্রন্থকারের লিখন-ভঙ্গীও ভাল।"

"প্রবাসী সম্পাদক"

৩। মতিয়া (উপন্যাস) ১।০

যন্ত্রস্থ—

১। রঙ্‌বেরঙ্‌ (কবিতা পুস্তক) ॥০

২। পরাজয় (উপন্যাস) ১।০

৩। পুরাণ বাড়ী (উপন্যাস) ১॥

শীঘ্রই বাহির হইবে।

প্রকাশক :—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স,
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ময়মনসিংহ।



মতিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের শেষ প্রান্তে, ছোট্ট নদীর বাঁকে, বৈরম আলীর সাদা ধবধবে ক্ষুদ্র বাড়ীখানি, জ্যোৎস্না আলোকে ঝলসিয়া উঠিত। বাড়ীর ঠিক পশ্চাতের জঙ্গল-সমাকীর্ণ-ছোট্ট-পাহাড়টি ছিল,—দৈত্যের ন্যায় কৃষ্ণকায়,—ভীতিপ্রদ! সন্ধ্যার ছায়ায়,—বাড়ীটি যেন ভীষণ দৈত্য-দৃষ্টিতে অবলোকিত হইত! সমীরণের মৃদু সঞ্চালনের সহিত, একটা সন্ সন্ শব্দ উত্থিত হইয়া, বাড়ীর চারিদিক যেন কম্পিত করিতে থাকিত।

বাড়ীর সম্মুখে,—ক্ষুদ্র-উদ্যানের বেড়ার উপর, মাধবীলতার স্তবকে-স্তবকে, শুভ্র ও রক্তবর্ণ কুসুমগুলি,—স্নিগ্ধ-সন্ধ্যা-সমীরণের আন্দোলনে, এদিক ওদিক দুলিতে থাকিত। নির্জ্জন কাননে,—অগণিত পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে,—নিষ্পাপ ফুলের মতই,—বৈরম আলীর একমাত্র পুত্র,—হোসেন আলী,—আপন মনে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বৈরম আলী ছিল একজন ওস্তাদ গায়ক। সন্ধ্যার আলোকে, নদীর ধারে, নির্জ্জনে বসিয়া, তাহার কণ্ঠের স্বর লহরী, সুদূর দিগন্তে, নদীর সুশীতল শীকরাভিষিক্ত-সান্ধ্য-সমীরণে,—মিশাইয়া দিত। তাহার সঙ্গী হইত ঝিঁঝিঁ পোকা;—আর জোনাকী পোকাগুলি তাহাদের আগুনের ফুলঝুরী জ্বালাইয়া, চারিপার্শ্বে নৃত্য করিতে থাকিত! সন্ধ্যা যখন ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিত,—তখন বৈরম আলী একাকী বসিয়া,—মুগ্ধ হইয়া যাইত সেই অপরূপ আলোক বাণের উজ্জ্বলতায়,—আর স্বীয় মুখ-নিঃসৃত মন-মাতানো সুরের খেলাতে!

তাহার নাম না জানিত, এরূপ লোক সেই অঞ্চলে খুব কমই ছিল। এমন কি খোদ বাদসা,—মীর আবদুল রসিদও তাহার গানে মুগ্ধ হইয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। এমন একদিন ছিল, যখন বৈরম আলীর ধন, সম্পত্তি, সম্পদ ও প্রতিপত্তি দেখিয়া অনেকেই ঈর্ষা-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে কালের নির্ম্মম-আঘাতে,—তাহার সমস্তই একে একে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! সেই অতীত সুখ-স্মৃতিই, এখন তাহার জীবন সম্বল,—সেই স্মৃতির মাদকতাই তাহাকে একমাত্র সরস ও সতেজ রাখিয়াছে।

সাতটি বৎসরের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া,—তাহার মস্তক, অসীম দৈন্যের পদতলে লুণ্ঠিত করাইয়া দিয়া,—একেবারে চিরদিনের মত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল!

পত্নী—খাতেমা বিবি,—সেই অঞ্চলের সুন্দরী মহলে, বিশেষ রূপবতী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল,—তাহার সেই রূপের ভাণ্ডার একত্র জড় করিয়াই যেন,—একমাত্র পুত্র হোসেন আলীকে উপঢৌকন দিয়াছিল! বৈরম আলীর অন্তরখানি,—খাতেমা বিবির পতিপ্রেম,—স্নেহ ও ভালবাসার আকর্ষণে, মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার পর

প্রথম পরিচ্ছেদ

খাতেমা বিবি—জননীর স্থানে অভিষিক্ত হইয়া,—অপরিসীম স্নেহ-ধারায় মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল;—কিন্তু কালের অসীম আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া,—মাত্র বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, সে সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া,—স্বামী পুত্রের নিকট হইতে,—চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল!

তিন বৎসরের পুত্র—হোসেন আলীর মর্ম্মন্তুদ-বেদনা-মথিত শোকাশ্রু-ধারা রুদ্ধ করাইতে হইয়াছিল,—অসহায় পত্নী-বিয়োগ-বিধুর বৈরম আলীকেই! অবোধ শিশু যখন পিতার বুকে চড়িয়া, গলা জড়াইয়া, দেয়ালে ঝুলান জননীর ছবির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া,—অশ্রু-বিজড়িত স্বরে,—মা চল,—মা যা'ব,—প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিত,—তখন বৈরম আলী উচ্ছ্বসিত শোক-বেগ দমন করিতে না পারিয়া,—অঞ্চলে নয়নদ্বয় ঢাকিয়া ফেলিত এবং ছেলেকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে,—ফল, ফুল,—কিংবা পাখীর ছানার সন্ধানে নদীর ধারে ছুটিয়া যাইত,—উন্মত্ত-অধীর-চিত্তে!

খাতেমার অভাবে, বৈরম আলীর অন্তরটা যেন জাঁতায় পিষিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছিল! পত্নীর প্রতিদিনের কথাগুলি,—চলাফেরার স্মৃতি,—তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়া,—বিছার হুলের মতই অসীম জ্বালায় তাহাকে দহন করিতে থাকিত! তাহার অন্তর যেন খাতেমার খোঁজে, সমস্ত বিশ্বে ছুটিয়া বেড়াইত,—কি এক অসীম বেদনায় তাহাকে পাগল করিয়া ফেলিত! বেলা শেষে,—সন্ধ্যা যখন তাঁহার আঙ্গিনা ছাইয়া ফেলিত,—বৈরম আলী কখনও শোক-বেগ-ক্লিষ্ট-অধীর-চিত্ত লইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িত এবং পত্নীর ছবিখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া,—ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিত। তাহার হৃদয়ে একটা বিরাট অন্ধকার সাড়া দিয়া,—তাহাকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিত!

কি যেন ছিল,—কি যেন হারাইয়া গিয়াছে,—এমনি একটা তন্ময়ত্ব,—অনুভূতির ভিতর দিয়া, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত,—ফলে অনেক দিন, সমস্ত রাত্রি, বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিতে সে বাধ্য হইত! সেই স্মৃতির তন্ময়ত্বটুকুন তাহার অন্তরে চিরতরে বিরাজিত থাকিয়া,—পবিত্র প্রেম-প্রস্রবণের সুশীতল-ধারায়, তাহার চিত্তকে সুখ-প্রদীপ্ত করিয়া রাখিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবনের একমাত্র সম্বল পুত্রকে—বৈরম আলী সর্ব্বদাই আগ্রহ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। পত্নীর রূপলাবণ্যমণ্ডিতা ছাবখানি,—পুত্রের মুখ-মণ্ডলে, অপরূপ আবছায়ার মতই অবলোকন করিত। বৈরম আলী অপলকনেত্রে, পুত্রের মুখপানে চাহিয়া থাকিত,—সেই অনাবিল ভাবস্মৃতি যেন নির্ম্মল উষালোকের মতই তাহার দেহ, মন উজ্জ্বল ও পবিত্র করিয়া দিত। পত্নীর বিয়োগ-স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দিয়া একটা তন্ময়ত্ব ভাব-স্ফুরণ তাহার অন্তরে আশ্রয় লাভ করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সুপ্ত ভাবগুলি সরস ও জীবন্ত হইয়া,—সমস্ত চিন্তাকে পরিবেষ্টন করিয়া,—তাহাকে তৃপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যাইত।

পুত্রের অনিন্দ্য-ছবিখানি যেন বিকশিত শতদল-শোভায়,—কমলার কনক প্রতিমার মতই তাহার চক্ষে মহামহিমময় হইয়া প্রকাশ পাইত। সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাপ-দগ্ধ-জীবন, সেই মহামিলনের আনন্দ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত!

বৈরম আলী পুত্রকে কখনও কাছছাড়া হইতে দিত না। তাহার আব্দার প্রতিপালন করাই, বৈরম আলীর জীবনের মুখ্য-ব্রতরূপে পরিণত হইয়াছিল। হোসেন আলী ক্রমে, সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া

চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈরম আলী তাহাকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করাইবার জন্য মাদ্রাসায় ভর্ত্তি করাইয়া দিল। পুত্র—পিতার আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। হোসেনের প্রতিভা-খ্যাতি যখন সকলের মুখে শ্রবণ করিত, বৈরম আলীর বুক তখন গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিত সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যগ্র বাহু স্নেহ-বিচ্ছুরিত-স্নিগ্ধ-ছায়া বিস্তার করিয়া পুত্রকে বক্ষে টানিয়া আনিত এবং তাহার উচ্ছ্বসিত সস্নেহ-দৃষ্টির ভিতর দিয়া, অসীম আনন্দের প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতে থাকিত। বৈরম আলী যেন সংসারে ভূস্বর্গ সৃষ্টি করিয়া, তাহার অমৃত-ধারা পান করিয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিল।

বৈশাখ মাসের প্রখর রবিকরে, পল্লীটার বুকের উপর দিয়া যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল। বাতাসের সাড়া মাত্র নাই! সারি সারি বৃক্ষগুলি যেন অনড়ভাব ধারণ করিয়া,—সেই জ্বালাভরা উত্তাপের ক্রোড়ে, আত্ম-সমর্পণ করিয়া,—শীতল সায়াহ্নের প্রতীক্ষায় তাকাইতেছিল!

অদূরে পাহাড়,—সাত মহলা রাজপুরীর ছবি রচনা করা; বিসর্পিত রাস্তা,—ধাপের পর ধাপের সরু রেখা জড়াইয়া,—আকাশ, পাতাল ব্যাপিয়া, যেন আলিঙ্গনের উদ্যত-বাহু মেলিয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল।

এম্‌নি অলস মধ্যাহ্নে, রৌদ্রে তেতাল,—হোসেন আলী, তাহার পুস্তকের বোঝা হাতে করিয়া, কাজী সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া,—মাদ্রাসা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। সূর্য্যের উত্তাপের খানিকটা যেন ঠিক্‌রাইয়া,—তাহার সারা দেহে, আগুন ধরাইয়া দিতেছিল। অসহ্য তাপে,—তাহার মুখমণ্ডল, শুষ্ক ও মলিন ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঘর্ম্ম তাহার সমস্ত কপোলদেশ সিক্ত করিয়া, নির্ঝর ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছিল।

হোসেন,—কাজী সাহেবের বাড়ীর পার্শ্বের শাখানিবিড় আম্রকুঞ্জের পাকা বাঁধান তলাটিতে যাইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে দীঘী,—কূলে কূলে ভরা জল,—যেন কাকচক্ষু! চারিধারে কচি ঘাসে যেন শ্যামল হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ,—সেই নিস্তব্ধ ভেদ করিয়া,—তাপদগ্ধ একটী ঘুঘুর কম্পিত কণ্ঠের সকরুণ ডাক,—আর পাতার তর্ তর্ রব ছাড়া, সমস্তই নিঝুম,—সমস্তই নীরব!

হোসেন আলী বামপার্শ্বে দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিল,—একটী আট নয় বৎসরের বালিকা,—গোলাপজাম গাছের নীচে, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তরুণীর গায়ের রঙটা খুবই ফর্সা। কমনীয় মুখে ও তন্বী দেহ-লতায়,—একটা মন মাতানো শ্রী ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। তাহার পরিধানে নভ রঙের সাড়ী,—গায়ে সিল্কের জামা, পায়ে জরিদার সেলিমসাহী নাগ্‌রা জুতা। কাল চোখের তলে, দীঘীর কাল জলের মত, তাহার স্বচ্ছ চাহনির আলো, পুলক-শিহরণের-বন্যায় ভরপুর! হোসেন,—সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ-দৃষ্টিতে,—সেই বালিকার চিন্তা-ম্লান-মুখের পানে কয়েকবার তাকাইয়া,—আবার স্বীয় গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ঠিক্ সেই সময়,—বালিকা,—হোসেন আলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া,—তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। বিস্ময়-বন্যায় মনের দুকূল ভাসাইয়া,—বালিকা,—হোসেন আলীর মন-ভুলান মূর্ত্তি অবলোকন করিল এবং একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িল। শেষে নির্ভীকের ন্যায়,—ঢেউ খেলান একরাশি কাল চুল উড়াইয়া,—হোসেনের সম্মুখীন হইল। নিতান্ত পরিচিতের মতই যেন তাহাকে গ্রহণ করিয়া,—বালিকা—হোসেনের হস্ত ধারণ করিল,—এবং বালিকা-সুলভ-ব্যাগ্রকণ্ঠে বলিল—"আপনি আমাকে কয়েকটা গোলাপজাম পেড়ে দিন্ না!

দেখুন, কেমন পাকা জামগুলি,—গাছের ডালে সাজান রয়েছে,—আপনিও খাবেন,—আমাকেও দিবেন এখন,—কেমন? এ-আমাদেরই গাছ,—কেউ কিছু বল্‌বে না,—বুঝ্‌লেন?"

হোসেন আলী,—বালিকার নির্ভীকতা ও সরলতা লক্ষ্য করিয়া,—তাহার মুখের দিকে তাকাইল। তাহার দুইটী ডাগর ডাগর চক্ষু,—বিচিত্র মহিমায়,—হোসেনের দৃষ্টিকে পলকহারা করিয়া দিল। সেই দৃষ্টি যেন শুধু অভিরাম নহে,—অভিনব ভাবেরই পরশ মাখানো ছিল! সেই দুইটী চোখে,—দুকূল ভাঙ্গা, বান ডাকাইয়া, হোসেনের দৃষ্টিকে বিপুল বিস্ময়ের রেখাপাতে যেন বন্দী করিয়া ফেলিল। হোসেন কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ফিক্ করিয়া একগাল হাসিল,—শেষে প্রশ্ন করিল—"তোমার নামখানা কি,—বল দিকিন্?"

বালিকা অপলক-দৃষ্টিতে,—হোসেন আলীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "আমার নাম—মতিয়া।"

হোসেন আলী,—মতিয়ার আগ্রহান্বিত মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—"তোমার পিতার নামখানা কি—বল দিকিন্?"

বালিকা বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি ঘুরাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ইব্রাহিম কাজী, তাঁকে আপনি চিনেন না? সম্মুখের ঐ বাড়ীটাই-ত আমাদের।"

হোসেন আলী তাহার মুখভঙ্গী অবলোকন করিয়া, একেবারে তন্ময় হইয়া গেল;—তাহার মনে হইল,—মতিয়ার মুখখানি হাসি-রাঙ্গা-ফুলের-পাপড়ি দিয়া তৈয়ারী করা—একখানা মায়া-প্রতিমা! যেন সোণার গাছে, হীরার ফুলের মতই,—রূপে ভরা, আলোয় গড়া,—মায়াপুরীর রাজকন্যা!

হোসেন আলী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া,—পুঁটুলীটি ভূমিতে রাখিল,—এবং ধীরে ধীরে গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

মতিয়া পুস্তকের পুঁটুলীটি হাতে তুলিয়া লইয়া,—তাহার কণ্ঠের ভিতর একটা মিছি-ভৎ’সনার সুর মিশাইয়া বলিল “বেশ মানুষ আপনি কিন্তু,—পুস্তকগুলি ধূলি মেখে,—নোঙ্‌রা হয়ে গেল যে,”—পরমুহূর্ত্তেই পুঁটুলীর গাত্র-সংলগ্ন সামান্য ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিল এবং হোসেন আলীর বৃক্ষারোহণ কৌশল লক্ষ্য করিতে লাগিল।

হোসেন আলী বৃক্ষারোহণে বিশেষ পটু ছিল না; কিন্তু মতিয়ার কাতর অনুরোধ উপেক্ষাও করিতে পারিল না। কাজেই বহু ব্যর্থ প্রয়াসের পর,—অতি কষ্টে, গাছের উচ্চস্তরের একটা মোটা শাখায় যাইয়া দাঁড়াইল। শেষে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কতকগুলি সুপক্ক গোলাপজাম সংগ্রহ করিয়া, অতি সন্তর্পণের সহিত গাছ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। সেই সময় হঠাৎ হাত ফসকাইয়া, হোসেন আলী ছিট্‌কাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

মতিয়া উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বলিল “এই যা,—পড়ে গেলেন?” বলিয়াই দ্রুতগতিতে হোসেনের সম্মুখীন হইয়া,—হস্ত ধারণ করিল এবং উত্তোলন করিবার ব্যর্থ-প্রয়াস করিতে লাগিল।

শরীরের কোন কোন স্থানে আঘাত অনুভব করিলেও,—হোসেন আলী নিতান্ত অপ্রতিভের মত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। শেষে সলজ্জ হাসি হাসিয়া,—গোলাপজাম কয়টি, জামার পকেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মতিয়ার হাতে তুলিয়া দিল।

মতিয়া ঈপ্সিত বস্তু করায়ত্ত করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত ফলগুলির পানে তাকাইয়া রহিল,—শেষে হোসেন আলীর প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিল “গাছ হ’তে পড়ে—খুবই ব্যথা পেয়েছেন বোধ হয়? আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট ক’রতে হ’ল আপনাকে,—নয় কি?

হোসেন,—মতিয়ার বলিবার ভঙ্গি ও আদব-কায়দা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত, আড়ষ্ট—অভিভূতবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া,—তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়া বলিল "এমন আর কি-ই-বা কষ্ট হয়েছে! তা' তুমি কিচ্ছু মনে করো না।"

গৃহে গমনোদ্যতা মতিয়া,—হঠাৎ হোসেনের পায়ের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিল "এ—কি? আপনার পায়ের অনেকটা যায়গা যে কেটে গেছে! কেমন তর্ তর্ করে রক্ত ঝরে পড়্‌ছে! মাগো মা! ধন্যি মানুষ আপনি কিন্তু,—মুখে বল্‌ছেন কি না—কিচ্ছু কষ্ট হয় নি!" বলিয়াই মতিয়া হাতের ফলগুলি জামার পকেটে তুলিয়া রাখিয়া,—ত্বরিত পদে,—হোসেনের ক্ষতস্থান দুই হাতে চাপিয়া ধরিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া,—ক্ষতস্থান বাঁধিতে লাগিল।

হোসেন সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। ক্ষতস্থান অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিল,—অনেকটা স্থান কাটিয়া গিয়াছে। হোসেন কোনই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। নিতান্ত নির্লিপ্তের ভাব দেখাইয়া বলিল "যাক্ এর জন্য তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। জলপট্টি দিলেই সব সেরে যাবে।" পর মুহূর্ত্তে হোসেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুস্তকের পুঁটলীটি হাতে তুলিয়া লইয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মতিয়া হোসেনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া,—তাহার দক্ষিণ হস্ত সাগ্রহে ধারণ করিল,—শেষে চক্ষু ঘুরাইয়া,—মাথা নাড়িয়া বলিল "না—এ অবস্থায়,—আপনার পক্ষে হেঁটে বাড়ী যাওয়া সম্ভবপর হবেই না! চলুন আমাদের বাড়ী,—আপনার ক্ষতটা ভাল করে বেঁধে দি-গে।"

মতিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, হোসেনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। হোসেন আলী যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিঃশব্দে মতিয়ার অনুগমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মতিয়া হোসেনকে সঙ্গে করিয়া, জননী—হালিমা বিবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নিতান্ত দোষীর মতই গাঢ় রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া, মতিয়া কম্পিত স্বরে, জননীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং কুঞ্চিত-ললাটের স্বেদ-বিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে রুমালখানা অপসৃত করিয়া ক্ষতস্থান জননীকে দেখাইল।

বিষাদ-পরিলিপ্ত-দৃষ্টিতে হোসেনের মুখপানে তাকাইয়া হালিমা বিবি, বিস্ময়-চকিত-নেত্রে, ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন,—তাঁহার শান্ত গম্ভীর মুখের দৃঢ় পেশীগুলি, এই অস্বস্তির আলোড়নে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং মুখে শীর্ণ পাণ্ডুতা স্ফুটতর দেখাইতে লাগিল। তিনি একটা বক্ষোভেদী তীব্র শ্বাসকে গ্রহণ ও মোচন করিয়া বলিলেন—"অনেকটা স্থান কেটে গেছে যে! রুমালখানা খুলে ফেল্‌লি কেন পাগ্‌লি!"

অতঃপর হালিমা বিবি, হোসেনকে একখানা চেয়ারে উপবেশন করাইয়া, ক্ষতস্থানে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কন্যার আহ্বানে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কাজী সাহেব তথায় আগমন করিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, হোসেনের মুখপানে তাকাইলেন। বিস্ময়-মুগ্ধ-নেত্রে তিনি হোসেনের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"বৈরম ওস্তাদজীর ছেলে,—হোসেন এ যে! গাছে উঠার অভ্যাস নেই—তাই এত বড় আঘাতটা পেয়েছে!"

কাজী সাহেব স্বীয় শয়নকক্ষ হইতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটী শিশি আনিলেন, এবং কিছু "আরক" ক্ষতস্থানে লাগাইয়া, ক্ষতস্থান

বাঁধিয়া দিলেন। শেষে দৃঢ় স্বরে, হোসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমি, পাগ্‌লির কথায় গাছে উঠ্‌তে গেলে কেন? মা-মরা ছেলে, গুরুতর ব্যথাটাই পেয়েছে!"

মতিয়া এতক্ষণ বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখে পার্শ্বে বসিয়াছিল। পিতার ঈষৎ তিরস্কার-পূর্ণ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হোসেনের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"হোসেন, ভাই! কিছু মনে করো না, আমাকে ক্ষমা কর।"

হোসেন—মতিয়ার কাতরতা-পূর্ণ দৃষ্টি ও মুখমণ্ডলের আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। শেষে মতিয়ার প্রতি তাকাইয়া, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল "কিছু হয় নি,—এখনি সেরে যাবে,—তুমি কিছু ভেব না।"

কাজী সাহেব হোসেনের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়া ও মাতৃ-বিয়োগের কথা বিবৃত করিয়া, স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে হালিমা বিবি, একে একে তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা যমের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আজ হোসেনের মুখ পানে তাকাইতেই, তাহার সেই পুত্র-শোক নূতন করিয়া অন্তরের অন্তস্তলে আঘাত করিল। তিনি হোসেনকে বক্ষে টানিয়া আনিয়া স্নেহের অজস্র-ধারায় অভিষিক্ত করিলেন। তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানা থালা, নানা মিষ্টি সামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া, হোসেনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং স্নেহ-বিজড়িত-স্বরে, জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। হোসেন কোন আপত্তি না করিয়া, মতিয়াকে সঙ্গে করিয়া জলযোগ সমাধা করিল।

ইহার পর হালিমা বিবি হোসেনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে অনেক সময় কাটাইয়া দিলেন; এই সামান্য আলাপ পরিচয়ে হোসেন হালিমার

অন্তর দখল করিয়া বসিল। এই মাতৃহীন বালকের উপর হালিমার অন্তরের টান, হৃদয় ছাপিয়া, উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

নানা প্রসঙ্গে প্রায় একটি ঘণ্টা অতিবাহিত করিবার পর, মতিয়া হোসেনকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর চারিদিক পরিভ্রমণ করিল। শয়নকক্ষ, ভোজনকক্ষ, স্নানাগার, বৈঠকখানা প্রভৃতির অসামান্য পারিপাট্য অবলোকন করিয়া হোসেন মতিয়ার পাঠাগারে যাইয়া আসন গ্রহণ করিল। মতিয়া নানা কথায়, হোসেনের অন্তরের সমস্ত গ্লানি বিধৌত করিবার উদ্দেশ্যে, আত্ম-নিয়োগ করিল। পরিশেষে তাহার ছবির বহিগুলি একে একে বাহির করিয়া হোসেনকে দেখাইতে লাগিল। প্রত্যেক ছবির বিষয়ীভূত প্লটগুলি, সরল সহজ কথায় প্রকাশ করিয়া, হোসেনকে তন্ময় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

দেয়ালের গাত্রে একখানা "মাতৃমূর্ত্তির" ছবি ঝুলান ছিল। মতিয়া—সেই ছবিখানা হোসেনের সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া, কৌতুক-বিহ্বল-স্বরে বলিতে লাগিল "হোসেন, ভাই! দেখ দেখি কেমন সুন্দর এই ছবিখানা। জননী হাসিমুখে বসে রয়েছেন, তাঁর ছোট ছেলেটী, পার্শ্বে আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জননী কত সোহাগ-ভরে চুমো খাচ্ছেন। এ ছবির মত আমিও অনেক দিন মাকে বসিয়ে, এমন ধারা কত চুমো আদায় করেছি! মা—ছল্ ছল্ চোখে আমাকে যখন বক্ষে চেপে ধরেন, তখন আমার মনটা আনন্দে মেতে উঠে! হোসেন, ভাই! তোমার মা কত দিন হল মারা গেছেন? তুমি কখনও কি এমন করে মা'র কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার সুবিধে পাও-নি?"

হোসেন কোনও প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না। সে নীরবে বসিয়া তাহার স্নেহ-বুভুক্ষু অন্তরের প্রতি পর্দ্দায় সহস্র বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিতে লাগিল। হোসেন কেবলি ভাবিতে লাগিল, আজ যদি আমার মা

থাকৃতেন, আমিও-ত জীবনে কত সুখ অনুভব কত্তে পাত্তুম, হায়! খোদা! আমাকে কেন এম্‌নি ভাবে দীন সাজিয়ে জগতে বিচরণ কত্তে পাঠিয়েছ? হোসেন ছবিখানি দুই হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, অপলক-চোখে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা অদম্য শোকের আবেগে তাহার অন্তর মথিত হইতে লাগিল। হোসেন অন্তরপ্লাবী সেই দীর্ণ আবেশের ঝাঁজ সহ্য করিতে না পারিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চক্ষু দুইটা ছাপিয়া অজস্র-ধারায় অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল!

মতিয়া হোসেনের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে অপ্রতিভ বনিয়া গেল। সে তাহার বস্ত্রাঞ্চলে হোসেনের চক্ষুদ্বয় মুছাইয়া দিয়া, ব্যাকুল আগ্রহে জননীকে আহ্বান করিল। হালিমা বিবি অচিরেই সেই কক্ষে পদার্পণ করিয়া, হোসেনের তাদৃশ পরিবর্ত্তনের কারণ অবগত হইলেন। তাহার বক্ষ মুহূর্ত্তে গভীর আবেগে স্ফীত হইয়া উঠিল, তাঁহার বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় ভেদ করিয়া, উষ্ণ জলের তপ্ত বাষ্প উত্থিত হইয়া, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি যেন তীক্ষ্ণ-শব্দভেদী-তীরে বিদ্ধ হইয়া হোসেনকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিলেন "বাবা! এই ত আমি তোমার মা, ছিঃ—কেঁদ না, আজ হতে তুমি আমার ছেলে, তুমি আমাকে মা বলেই ডেক।"

হোসেন—হালিমা বিবির বক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে শোকের আবেগ প্রশমিত হইলে, হোসেন কয়েক মুহূর্ত্ত অপলক-দৃষ্টিতে হালিমা বিবির মুখপানে তাকাইয়া, চক্ষু নত করিল। হালিমা বিবি হোসেনের নয়নদ্বয় বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"হোসেন! আমাকে মা বলে ডাক। আমি যে তোমারও মা।"

হোসেন হৃদয় আবেগে আত্মহারা হইয়া, হালিমা বিবির প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাকাইল এবং গদ্গদকণ্ঠে ডাকিল "মা!" হালিমা বিবি প্রত্যুত্তরে বলিলেন "কি বাবা!"

সেই মা শব্দ সম্বোধন করিয়া, হোসেনের অন্তর যেন আজ নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। তাহার মনে হইল, আজ যেন তাহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়, দৃশ্যপটের মতই তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! হালিমা বিবিও যেন সেই মা সম্বোধনে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার শিরা ও উপশিরার মধ্য দিয়া অপরিসীম আনন্দের তড়িৎ তীব্রবেগে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল! সে কি অনুভূতি! কাহার যেন মায়া-যষ্ঠির স্পর্শ-সুখে, তাঁহার অন্তর স্নেহ-তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া গেল।

হালিমা বিবি হোসেনের মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিন দুই বেলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া, প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন!

ক্রমে সুখ-দুঃখের পট পরিবর্ত্তনের মতই, আলোক ও আঁধারের খেলা লইয়া, পঞ্চমীর চাঁদ আকাশ-পথে ফুটিয়া উঠিল! পশ্চিম গগনে দিনান্তের ক্লান্ত-রবি নিতান্ত নিষ্প্রভ ম্লান-মুখে [illegible] মুমূর্ষের মতই ঢলিয়া পড়িলেন! হালিমা বিবি একজন ভৃত্য [illegible] দিয়া, হোসেনকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ইব্রাহিম কাজী সেই অঞ্চলে একজন প্রতিপত্তিশালী লোক। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়াও, অহঙ্কার বলিয়া একটা জিনিষ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বয়স চল্লিশের কোঠায়। তাঁহার বিচারে সকলেই সন্তুষ্ট থাকিত, তিনি বিচারকালে এমনি বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিতেন যে, তাঁহার অকাট্য যুক্তির উপর, কাহারও কোন মন্তব্য প্রকাশের সুবিধা থাকিত না!

বাদসা এই কারণে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা আটটায় কাজী সাহেব, মতিয়াকে সঙ্গে করিয়া বৈরম আলীর গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন—"ওস্তাদজি"! সেই অঞ্চলের সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদজী নামে ডাকিত, কাজী সাহেবও সেই নামেই ডাকিতেন।

বৈরম আলী সেই সময়, একাকী বসিয়া এস্‌রাজ বাজাইয়া গান করিতেছিল। তাহার সুরের হাওয়া, অদূরের পাহাড় ছাপাইয়া যেন আকাশের অসীম সীমান্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সুরের মূর্চ্ছনা আগুনের ফুল্‌কীর মতই মনের দ্বারে আসিয়া যেন, দীপালীর দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছিল!

আগন্তুকের আহ্বান কর্ণে পৌছিতেই বৈরম আলী গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্ময়-বিহ্বল-দৃষ্টিতে কাজী সাহেবের মুখপানে তাকাইয়া বলিল—"এই যে কাজী সাহেব, আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক, আজ আমার সুপ্রভাত বল্‌তে হ'বে।" বলিয়া বারেন্দা হইতে একখানা কেদারা টানিয়া আনিয়া, কাজী সাহেবের হস্ত ধারণ করিয়া, বসিতে অনুরোধ করিল।

কাজী সাহেব আসন গ্রহণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"তা আপনি-ত আর যাবেনই না, আমিই আজ হোসেনকে দেখতে এলুম,—কেমন আছে হোসেন? আমরা সারারাত্রি বড়ই উদ্বেগে কাটিয়েছি।"

বৈরম আলী একগাল হাসিয়া বলিল—"এ আপনাদের বিশেষ অনুগ্রহই বলতে হ'বে। হোসেন ভালই আছে, সামান্য একটুকুন

কেটেছিল বৈ-ত নয়, আপনার ঔষধেই অনেকটা সেরে গেছে। ভাব্‌বার কিছুই নেই এতে। হোসেন আপনাদের বিশেষ পরিচর্য্যার কথা বলেছে। আপনাদের অত্যধিক যত্ন ও স্নেহের জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ!”

এম্‌নি সময়ে, হোসেন—ঘরের বাহিরে আসিয়া, কাজী সাহেবকে অভিবাদন করিল। পরে নত মস্তকে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাজী সাহেব হোসেনের মস্তকে হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলেন—“আমরা এমন কী-ই যে করেছি, যা'র জন্য ওস্তাদজীর মুখে প্রশংসার সীমা নেই?”

হোসেন স্মিত-মুখে বলিল—“আপনাদের আদর ও যত্নের কথা জীবনে ভুল্‌ব না। নিজের দোষেই আঘাত পেয়েছি, মতিয়ার-ত কোন দোষই ছিল না এতে!”

মতিয়া এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সে এক গাল হাসিয়া, হোসেনের হস্ত ধারণ করিয়া, ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল, শেষে ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—“গাছে উঠতে না বললে, তুমি কোনই আঘাত পেতে না। মা—তোমাকে দেখতে পাঠিয়েছেন, চল এখন তোমাদের সুন্দর বাগানটা দেখে আসি।” বলিয়া মতিয়া হোসেনের হাত ধরিয়া বাগানের দিকে চলিয়া গেল।

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন “মা-মরা ছেলে, আপনি যতই করেন না কেন, তবু যেন একটা ফাঁক থেকেই যাবে, শৈশবে মাতৃহারা হওয়ার মত, এত বড় অভিশপ্পাত বোধ হয় আর নেই। আমার স্ত্রী, [illegible] দেখার পর হ'তে, কেবলি হোসেনের কথা বলছে,—তাঁর মাতৃস্নেহ সজাগ হয়ে,

হোসেনকে অভিষিক্ত করেছে,—হোসেন আলীকে দিয়ে তাঁর পুত্রের স্থান পূরণ করে নিয়েছে। হোসেন এখন আমাদেরও ছেলে। রূপে গুণে এমন ছেলে, ক'জনার ভাগ্যে জুটে? আপনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী যাবেন, হোসেনকেও সর্ব্বদা পাঠিয়ে দিবেন। সে যে নূতন মা পেয়েছে!"

বৈরম আলী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল্লহাস্যে বলিল—"সবই খোদার ইচ্ছা। হোসেন তিন বৎসর বয়সে, ঝরা ফুলের মতই সংসার বক্ষে, ঝরে পড়ার মত হ'য়েছিল। মা-মরা ছেলেকে খোদার আশীর্ব্বাদে চৌদ্দ বৎসর বয়সে দাঁড় করিয়েছি। আপনাদের অযাচিত স্নেহ লাভ করা,—সেটাও খোদার অসীম দান।"

কাজী সাহেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আপনার বর্ত্তমান নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা যথনই মনে পড়ে, তখনি একটা অস্বস্তি জেগে,—মনোবেদনার সৃষ্টি করে। আপনি এ বয়সেও, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে, জীবনটাকে নূতন ধারায় পরিবর্ত্তন করে নিতে পারেন। এ ভাবে দীর্ঘ জীবন কাটান, আপনার পক্ষে সহজসাধ্য কি না,—আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।" বলিয়াই কাজী সাহেব বৈরম আলীর মতামতের অপেক্ষায় তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এই প্রস্তাবটি বৈরম আলী কি ভাবে গ্রহণ করিবে এবং কতটুকুন দৃঢ়তার সহিত আখ্যান বিষয় প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, তাহাই যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে, কাজী সাহেব—এত বড় কথার অবতারণা করিয়াছিলেন।

বৈরম আলী—একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কাজী সাহেবের মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া, গভীর পরিতাপের সহিত বলিলেন—"আমার ত্রিশ বছর বয়সে পত্নী বিয়োগ হয়েছে,—এ বয়সে বিপত্নীক হ'লে, অধিকাংশ লোকেই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ ক'রে, সংসারী হচ্ছে! তবে ভেবে দেখুন, প্রায়

সকলকেই নূতন সুখ-শান্তি ও তৃপ্তি-সম্ভোগের আয়োজন কত্তে গিয়ে, তেমনি নিঃসহায়ের মত আপনাকে বহু অশান্তির ভিতর ফেলে দেয়, যাঁ'র ঘাত প্রতিঘাতে অতিষ্ঠ হয়েও, বাধ্য হয়ে, শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে, মূক অভিনয় কত্তে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম ভালবাসাই মানুষের পক্ষে প্রথম ও শেষ ভালবাসা। যাঁ'রা এটা বিশ্বাস কত্তে চায় না, তাঁ'রা ভালবাসা জিনিষটাকে ঠিক করায়ত্ব কত্তে সক্ষম হয় নি! একটা রূপজ মোহের উপর, ভোগ-সম্ভোগের নেশাকে জড়িত করে, খাঁটি জিনিষটাকে বাদ দিয়ে ফেলে। ভালবাসা জিনিষটাকে বারবার জোড়াতালি দেওয়া চলে না। যে স্মৃতির বোঝা অন্তরের প্রতি স্তরে প্রস্রবণের মত প্রবাহিত হ'তে থাকে, তাকে একেবারে মুছে ফেলে, আর একটার ভিতর দিয়ে, তার পূর্ণ প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস, নিতান্তই বিড়ম্বনাময়! যদি একেবারে মুছে ফেলা না-ই চলে, তবে অন্তরের সেই দাগ, গোপন রেখে, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত, স্নেহের অসীম ধারা প্রবাহিত রেখে, তাল সাম্‌লাতে চেষ্টা করলে, ব্যর্থতার তীব্র-জ্বালার দাহন নিয়ে, তাকে মিথ্যা অভিনয় কত্তেই হবে। নব পরিণীতা পত্নী, বয়সের তারতম্য হিসাবে, পুতুল খেলার সামগ্রীর মতই অনেকটা হয়ে দাঁড়ায়। জোর করে একঘেয়ে শব্দ জড় করে মনস্তুষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসের ভিতর, তৃপ্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। নবীনার সহিত সমভাবে তাল সাম্‌লাবার প্রয়াস, নিতান্ত অসম্ভব বলেই, অশান্তির ইন্ধন বাড়িয়ে তোলে। আমার এই অবস্থায় একমাত্র স্মৃতির কণাকে, জীবনের সম্বল করে ছুটে চলেছি, এর ভিতর যে টুকুন তৃপ্তি, মাদকতা ও তন্ময়ত্বের প্রভাব বিস্তার করছে, এর নিকট ক্ষণিক সম্ভোগ-সুখের হীন-বৃত্তি, চিরদিনই প্রত্যাখ্যানের বিষয় [illegible] হয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাজী সাহেব আপন মনে বলিতে লাগিলেন—এসব বিষয় বুঝে অনেকেই, মুখেও অনেকেই অনেক কথা বলে, কৃতিত্বের প্রমাণও দিয়ে থাকে; তবে প্রলোভনের স্রোতে,—তৃপ্তির ইন্ধন জ্বালাবার পথ মুক্ত দেখ্‌লে, অনেকেরই সকল সঙ্কল্প কোথায় মিলিয়ে যায়! অতঃপর কাজী সাহেব প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার যুক্তির উপর আমার কোন বক্তব্য নেই। তবে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা সংসারে খুবই কম। মানুষের ভোগের বৃত্তিগুলি সেখানেই মস্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চ স্তরে ছুটে চলে, যেখানে ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংযমের পথে টেনে নিয়ে, অসীম মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁরাই এই পথ ধরে জগতে অমরত্বের সৃষ্টি কচ্ছেন। ভিতর বাহির করে, নিজকে সংযত করার মত আর শ্রেষ্ঠ পথ নেই। স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ নিয়ে নূতন ঘর বেঁধে নেয়, তারা [illegible] আগুনে পড়ে, নিজেও পোড়ে, অপরকেও পোড়ায়!"

বৈরম আলী একটুকু শুষ্ক হাসির সহিত বলিল "সংসারী [illegible] সেই অসীম পথ ধরে চলার মত সামর্থ্য সঞ্চয় করে উঠ্‌তে পারে না যদি অভ্যাসের দ্বারা, সময়-উপযোগী, নূতন পথ [illegible] নিতে পারে, তবে তা'তেই প্রকৃত শান্তির পথ মুক্ত করে দেয়। জানি না আমার এই সঙ্কল্প কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে। খোদার নিকট প্রার্থনা করবেন, আমি যেন তাঁর অমোঘ বিধান, মত-মস্তক বহন করে, তাঁর উপর আস্থা না হারাই। ভাঙ্গা ঘর জোড়াতালি দিয়ে, মাথা খাড়া করাতে গিয়ে, ঝড়ের বেগে যেন হুমড়ে পড়ার মত ছিদ্র বরণ না করি!"

কাজী সাহেব বৈরম আলীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "সাধনার ভিতর দিয়েই সাফল্যের পথ মুক্ত হয়। নির্লিপ্ততা হচ্ছে সাধনার

সোপান। যৌবনে উন্নীত হয়ে মহাপুরুষকেও সংসারী হতে হয়েছে,—সৃষ্টিকে ধ্বংসের কবল হ'তে রক্ষা করার জন্য!" আবার অসীম তন্ময়ত্বের ভিতর আপনাকে নির্ম্মমভাবে ফেলে দিলে, দেবত্বের দাবীও ত্যাগ কত্তে হয়। এ অবস্থা জেনে শুনে, যাঁরা আবার দিল্লীর লাড্ডু খেতে ব্যস্ত হয়, তা'দের যুক্তিতর্ক ভিত্তিহীন বলেই মেনে নিতে হবে।"

ঠিক এমনি সময়ে মতিয়া হোসেনকে সঙ্গে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মতিয়ার হস্তে ফুলের তোড়া। কেশদল ফুলের হারে সুসজ্জিত। ইন্দ্রধনুর মেখলাপরা স্ফটিকের ক্রমোন্নত স্তম্ভগুলির মতই যেন সুসজ্জিত তাহার তরুণ কোমল মুখখানা, স্বর্গের সুষমায় প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। মতিয়া স্মিতমুখে কাজী সাহেবের গলা জড়াইয়া বলিল "বাবা, বাবা! কী সুন্দর বাগানখানা দেখে এলুম! গাছে গাছে ফুলের গুচ্ছ, যেন কতই রঙের মেশামেশি! আমাদেরও এমনি একটা বাগান তৈরি কল্লে না কেন? হোসেন ভাই কত রকমের ফুল তুলে, আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে। আমি রোজই এখানে এসে, ফুল তুলে নিয়ে যাব,—কি বল?"

কাজী সাহেব প্রসন্ন-দৃষ্টিতে মতিয়ার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "বাগান তৈরি কত্তে চাইলেই কি বাগান তৈরি করা যায় পাগলি? অন্তরের ভিতর সেই পবিত্র ভাবের জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তি ফুটে উঠলে, তারই প্রেরণায়, সেই নিষ্পাপ ফুলের গুচ্ছ থরে থরে ফুটে উঠে' বাগানের সুহাস জাগিয়ে তুলতে পারে। চাই মন, আর চাই কার্য্যক্ষম হ'বার মত একান্ত অনুরাগ। তোমার চাচা স্বর্গের দূত,—তাঁর বাগান অপূর্ব্ব সুষমায় দীপ্তমান হ'বে, এর ভিতরে নূতনত্ব কি আছে।"

মতিয়া একগাল হাসিয়া বলিল "না বাবা! তুমি বাগান তৈরি করে দাও, আমি নিজে খুবই খাটুব, তোমাকে কিছু কত্তে হবে না।

হোসেন ভাই—আমাকে সাহায্য করবে বলেছে, দেখে নিও আমি কেমন করে বাগান সাজিয়ে তুলি।"

কাজী সাহেব সরলা বালিকার বলিবার ভঙ্গিতে তন্ময় হইয়া গেলেন। একগাল হাসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "আচ্ছা মা!—তা'ই হবে।"

মতিয়া বৈরাম আলীর প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিল "চাচা সাহেব, হোসেন ভাই আমাদের সাথে যাবে এখন, মা নিয়ে যেতে বলেছেন। ওখান হতেই মাদ্রাসায় যাবে, বলে দিয়েছেন। যেতে দিবেন—চাচা সাহেব?"

বৈরম আলী মতিয়ার উদ্বেগ-আকুল-মুখের প্রতি তাকাইয়া, তন্ময় হইয়া গেল এবং সম্মতিজ্ঞাপক মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল "আচ্ছা যাকে এখন।"

পর মুহূর্ত্তেই কাজী সাহেব গৃহে যাত্রা করিলেন। মতিয়া হোসেনের হস্ত ধারণ করিয়া, বালিকা-সুলভ নানা গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পর, অল্পদিনের মধ্যেই, এই দুই পরিবারের মধ্যে, বিশেষ হৃদ্যতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। হোসেন প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে কাজী সাহেবের বাড়ী যাইয়া, হালিমা বিবির সহিত নানা প্রসঙ্গে অনেক সময় কাটাইয়া দিত। হালিমা বিবির আগ্রহাতিশয্যের ফলে, এই দৈনন্দিন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার সাহস হোসেনের আদৌ ছিল

না। হালিমা বিবি হোসেনকে স্বীয় পুত্রবৎ গ্রহণ করিয়া, অন্তরের সঞ্চিত অপরিসীম স্নেহের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, মাতৃহীন বালকের, দৈন্য-বিধুর-জীবনে একটা শান্তির উৎস বহাইতে সচেষ্ট থাকিতেন। কোন ভাল জিনিষ হোসেনকে না খাওয়াইয়া, গলাধঃকরণ করিতেও যেন হালিমা বিবির বাধ বাধ ঠেকিত। তিনি মতিয়া ও হোসেনকে স্নেহের একই তুলা-দণ্ডে দাঁড় করাইয়া, তুল্যভাবে অন্তরের পুঞ্জীভূত প্রীতি-বাৎসল্যসম্ভূত—রস-সম্ভার ভাগ করিয়া দিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যদি হোসেনের, নির্দ্ধারিত সময়ে আগমনের ব্যতিক্রম ঘটিত, হালিমা বিবি—অন্তরে একটা জ্বালাভরা অস্বস্তির ইন্ধন জ্বালাইয়া, আগ্রহাতিশয্যে পথ পানে তাকাইয়া, পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। হোসেনও তাহার মাতৃহারা হৃদয়, এই অত্যধিক স্নেহের প্রেরণায় সরস ও সতেজ করিয়া, তৃপ্তির নিশ্বাস প্রদান করিত। হোসেন তাঁহাকে জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, "মা" সম্বোধনে তন্ময় করিয়া ফেলিত এবং নিঃসঙ্কোচে শত শত আব্দার করিয়া এবং অভাব অভিযোগের বিষয়গুলি সহজভাবে ব্যক্ত করিয়া, অন্তরের সমস্ত গ্লানি বিধৌত করিত।

কাজী সাহেব ও হোসেনের বাঁধ-হারা অবাধ মেলামেশা ও নিঃসঙ্কোচ সৌহৃদ্যতাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে অবলোকন করিতেন। তিনি মতিয়ার সহিত তুল্যভাবে, হোসেনকে ভাল ভাল পোষাক, পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রদান করিতেন। হোসেন যাহাতে কোন অভাব অনুভব না করে, তজ্জন্য তিনি সময়-উপযোগী, প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, তাহার করায়ত্ব করাইয়া দিতেন। হোসেনকে—স্নেহ-প্রীতিবন্ধনে, কাজী সাহেব ও হালিমা বিবি, একেবারে ঘরের ছেলের মত দখল করিয়া বসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে মতিয়া—হোসেনের সাহচর্য্যে, প্রীতি-ফুল্ল-মনে, ভরা পাল দেওয়া তরীর মতই, ছল্ ছল্ বেগে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ, একত্র স্নান, একত্র আহার, একত্র সান্ধ্য-ভ্রমণ, একত্র বসিয়া গল্পগুজব প্রভৃতি কর্ম্মগুলি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের ধারার মধ্যে পরিগণিত করিয়া, উভয়েই মধুরতম মানসিক বৃত্তির স্ফুরণের অবকাশ করিয়া লইত। হোসেনের পড়াশুনার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। হোসেনের সংস্পর্শে আসিয়া, মতিয়াও লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিল। মতিয়া প্রতিদিন নানারঙের ভাল ভাল ফুলে মালা গাঁথিয়া হোসেনকে সাজাইত। হোসেনও নানাস্থান হইতে, অনেক চিত্তাকর্ষক জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং মতিয়াকে উপহার দিয়া,—তাহার তরুণ-চিত্তে, তৃপ্তি সম্পাদন করিত। এম্‌নি করিয়া, এই দুইটী তরুণ-তরুণী, মুক্তপ্রাণ পাখীর মত, মধুর মোহে আপনাদিগকে মস্‌গুল করিয়া রাখিয়াছিল।

হোসেন, মতিয়ার সমস্ত আব্দার, অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিত, এবং সেই আব্দারের ধারগুলি স্নেহের দান বলিয়া গ্রহণ করিত। মতিয়া যখন হোসেনের বাড়ী হইতে, খেলা অন্তে, তাহার চঞ্চল অঞ্চলখানি উড়াইয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, চাহিতে চাহিতে, বাড়ী চলিয়া যাইত, হোসেন তখন মুগ্ধ-নেত্রে, তাহার চলিয়া যাইবার গতি লক্ষ্য করিত। ক্রমে মতিয়া যখন পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া পড়িত, হোসেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া, উদ্বেগ-মথিত-চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিত।

এই অসীম মেলামেশার ভিতর দিয়া, আরও চারিটী বৎসর কাটিয়া গেল। হোসেন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, আর মতিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের সন্ধিস্থলে উপনীত হইল। হেমন্তের শেষে যেমন বসন্তের

শুভাগমন হয়,—মুহূর্ত্তে ইন্দ্রজালের মতই গাছে গাছে, লতায় লতায়, একটা প্রাণ মাতানো, মোহময় সোহাগের সাড়া আনিয়া দেয়,—হোসেন ও মতিয়ার মধ্যেও সেরূপ একটা পরিবর্ত্তনের ধারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। নদীর উচ্ছল ঢেউয়ের উপর অবাধে ভাসিয়া যাওয়া জীবনের মধ্যে যেন,—সহসা একটা উদ্দেশ্যের অনুভূতি আসিয়া সুখপ্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। স্বপ্নাবসানে বাস্তবতার প্রেরণায়, শরীরের শক্তি সঞ্চালনের মতই, তাহাদের জীবনের প্রতি সূত্রে, নবভাবের উন্মাদনায় শক্তিমন্ত করিয়া দিল। এই নূতন ভাবের উন্মেষণার মধ্যে তাহাদের জীবনপদ্মের কোরকের উপর প্রথম সূর্য্য-রশ্মিপাতের মতই, একটা মধুরতম অনুভূতি যেন, আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তাহাদের রক্তের তালে, নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনে, যে অভাবনীয় স্ফুরণ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন আর ধরা না দেওয়া চলে না!

যে জিনিষ—আড়ম্বর ও বাক্য-সম্ভারে আত্মপ্রকাশ পায়, তাহা সকলকে সজাগ করিয়া দেয়। আবার যাহার বিকাশ নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ ও সুখলভ্য—হিল্লোলের মৃদু-কম্পনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহার স্মৃতির অক্ষয়-দাগ, চিরপ্রদীপ্ত থাকে। আর সেই দাগগুলি প্রতি রেখায় যে বেদনা,—যে রক্তপ্রবাহ, আপনা হইতে ফুটাইয়া তোলে তাহা কোনদিনই মুছিয়া ফেলা যায় না। মতিয়া ও হোসেনের স্নেহের টানের ভিতরও যেন সেই মূল-মন্ত্র গ্রথিত রহিয়াছিল।

প্রেম বল, ভালবাসা বল,—এমন একটা কিছু উভয়ের অন্তরে বিকাশ লাভ করিয়া, উভয়কে তন্ময় করিয়া দিয়াছিল। বুকে পোষা এই কৌস্তভ-মণির নয়নভোলা আলোর আঘাতে, উভয়েই যেন উভয়ের প্রতি চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই দুইটি তরুণ প্রাণের নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই, তাহারা যে পরিপূর্ণ সার্থকতার দিকে ছুটিয়া

চলিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে না ছিল মলিনতা, না ছিল আশঙ্কা, না ছিল পরিণাম চিন্তা ;—এক অসীম শক্তির প্রেরণায় যেন তাহারা ছুটিয়া চলিয়াছিল, আত্ম-বিস্মৃতির অগাধ সলিলে।

রাত্রিশেষে যেমন অন্ধকারের ভিতর, ধীরে ধীরে ঊষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়া, জগতে আলোকপ্লাবনের সৃষ্টি করে, তেমনি ভাবে যৌবন উন্মেষণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া, উভয়েই উভয়ের, একান্ত নির্ভর মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

মতিয়া যখন একা বসিয়া হোসেনের মোহনরূপ অন্তরে ধ্যান করিতে থাকিত, তখন তাহার মনে হইত, হোসেনের সেই কোমল স্নেহ-বিজড়িত নবীন সুরের প্রাণ-মাতান ভাবের কথা! আর সেই স্বর-সুধা, উন্মত্ত আগ্রহে উৎপ্রেক্ষিত হইয়া, শ্রাবণ-জলধারা-পুষ্ট-কল্লোলিনীর মতই, তাহাকে উন্মত্ত-অধীর করিয়া তুলিত। তাহার অন্তরে সর্বদাই যেন সেই সুরের রেষ মন ভুলানো ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া, সেই পথহারা, কুলহারা চন্দনবাসের মতই, সুরভি-স্নিগ্ধ করিয়া দিত। এই অন্তরস্রাবী স্নেহাকর্ষণের ভিতর দিয়া,—উভয়েই ছুটিয়া চলিয়াছিল,—সেই মিলনের সুদৃঢ় বন্ধনের দিকে,—যাহার রস-সম্ভারে, উদ্দাম তরঙ্গায়িত নদী,—সাগরের দিকে, যেমন আপনাকে নিঃস্ব করিয়া বিলাইয়া দিতে ছুটিয়া চলে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা পাঁচটা বাজিতেই কাজী সাহেব পুলক-চঞ্চল চিত্তে, অন্দরে প্রবেশ করিয়া, একটি প্রশস্ত কক্ষে যাইয়া উপবেশন করিলেন। কক্ষটি

বিশেষ পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত ছিল। সমগ্র কক্ষতল, মূল্যবান দেশীয় সতরঞ্চে মণ্ডিত। টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি বহুবিধ আসবাবে কক্ষের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল। প্রাচীর গাত্রে, বহু মহাপুরুষের তৈলচিত্র ছাড়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য-সমন্বিত, উৎকৃষ্ট চিত্রও শোভা পাইতেছিল। বহু ধর্ম্মগ্রন্থাবলী পরিপূর্ণ, কাঠের আলমারীগুলি প্রাচীর পার্শ্বে সুসজ্জিত ছিল।

জ্যৈষ্ঠমাস। ইতিপূর্ব্বে একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সিক্ত বৃক্ষপত্রের গাত্রসংলগ্ন জলবিন্দুগুলি, স্বুবর্ণ পিণ্ডবৎ দেখাইতেছিল। রৌদ্রে তাপিত ধূসর আকাশের ও পৃথিবীর, জ্বালাময়ী উত্তাপ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল। মৃত্তিকার নগ্ন রুক্ষ শ্রী,--বারিপাতে অনেকটা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছিল।

এম্‌নি সময়—হালিমা বিবি, একখানা রৌপ্য নির্ম্মিত, পরিমার্জ্জিত রেকাবীতে করিয়া, ঘরের তৈয়ারী নানাবিধ মিষ্টি সামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া, স্বামীর সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন এবং জলযোগ করিতে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হালিমা বিবি, কাজী সাহেবের কপোলদেশে নিপতিত, একগুচ্ছ চুল হইতে কয়েকটা পক্ক চুল উত্তোলন করিয়া, ব্যথা-ক্ষুব্ধ-স্বরে, উদ্দীপ্ত-ভঙ্গীতে বলিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি একেবারে বুড়ো হয়ে গেলে?"

কাজী সাহেব উদ্‌গ্রীব-আগ্রহে হালিমা বিবির মুখপানে তাকাইয়া, স্মিতমুখে বলিলেন "তা' কি তুমি এত দিন ঠাওর করে উঠ্‌তে পার-নি? এ-ত আমার কম কৃতিত্বের কথা নয় বল্‌তে হবে!"

উত্তর শ্রবণ করিয়া হালিমা বিবির সর্ব্বশরীরে সহস্র তাড়িৎ-শিখা যেন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে অন্তরের দ্রুত তাল

সংযত করিয়া বলিলেন "বুড়ো হতে চললে, তোমার রস যেন ছাপিয়ে পড়তে চাচ্ছে!"

কাজী সাহেবের মনোবীণায় আজ যেন অপরিসীম আনন্দের উচ্চসুর বাঁধা ছিল। তিনি তাঁহার অন্তরের পুঞ্জীভূত আনন্দধারার অনুসরণ করিয়া বলিলেন "আর ক'টা দিন-ই-বা বাঁচব, এই একমাত্র ভাব-রস সম্বল করে', দিনগুলি গুঞ্জরাণ যাচ্ছে। তবে এ-বিষয়ে ষোল আনা দোষ যে কেবল এক পক্ষেরই,—তা' ত মনে হয় না! এই ধর গিয়ে, বাইরের প্রবল জলপ্রবাহ না পেলে, শান্ত নদীবক্ষে কোনদিনই বান ডাকার সম্ভাবনা থাকে না,—বুঝলে ত? তুমিই ত এই রস-সম্ভারের মূলসূত্র!" বলিয়া কাজী সাহেব হোঁ হোঁ শব্দে হাসিতে লাগিলেন।

হালিমা বিবির বক্ষ-শোণিত, কল-কল্লোলে—সাগর তরঙ্গের মতই—উত্তাল হইয়া উঠিল। তিনি লজ্জার প্রবল উচ্ছ্বাসে,—নতমুখী হইলেন। শেষে দীর্ঘতর শ্বাস গ্রহণ করিয়া, রেকাবী হইতে একটি ক্ষীরপুলি তুলিয়া, স্বামীর মুখে গুঁজিয়া দিলেন। পর মুহূর্ত্তে সহাস্য বদনে বলিলেন "রঙ্গ রাখ এখন, সন্ধ্যা হয়ে এল, জলযোগ শেষ করে ফেল, একটা পরামর্শ রয়েছে।"

কাজী সাহেব পূর্ব্ববৎ উৎফুল্ল মুখে বলিলেন "এ-যে তোমার হল গিয়ে ফাও,—বকশিস্·········।"

কথায় বাধা দিয়া হালিমা বিবি দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ক্ষীরপুলির কিয়দংশ মুখের বাহির হইয়া, পত্নীর হস্তের চাপে, কাজী সাহেবের সুদীর্ঘ গুম্ফ ও দাঁড়িতে মথিত হইয়া, এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল।

রুমালে চোখ মুখ মুছিয়া ফেলিয়া, কাজী সাহেব সহাস্য বদনে বলিলেন "লড়াই করবে না কি? বড্ড পালোয়ান হয়েছ দেখ্‌ছি? আচ্ছা দেখ্‌ব এখন পরে!"

স্বামীর ব্যাঙ্গোক্তির ঝাঁজে, হালিমা বিবির কানের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর প্রতি, অতৃপ্ত অনিমেষ দুইটি বুভুক্ষিত চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার সেই বিশাল চোখের কটাক্ষ, ঈষৎ স্ফুরিত গোলাপী আভাযুক্ত অধর পুটের হাসিটুকুর ভিতর দিয়া, সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া, স্বামীর অন্তরে এক সুশীতল প্রলেপ বুলাইয়া দিলেন। কাজী সাহেব একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, গমনোদ্যতা স্ত্রীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক, পার্শ্বের চেয়ারে আনিয়া উপবেশন করাইলেন। পরে অধীর অগ্রহে বলিলেন "কি বিষয়ের পরামর্শ কর্‌বে,—বল্‌ই-না শুনি।"

হালিমা বিবি দৃঢ়স্বরে বলিলেন "আগে জলযোগ সেরে নাও,—পরে সে কথা বল্‌ব এখন,—ব্যস্ত হবার কিছুই নেই এতে।"

কাজী সাহেব কয়েক মিনিটের মধ্যে জলযোগ শেষ করিয়া, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া, তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

হালিমা বিবি শ্রদ্ধা-মাখান-দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর উন্নীত করিয়া বলিলেন "এমন বিশেষ কিছুই নয়,—তবে কথাটা হচ্ছে এই,—মতিয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাগর হয়ে উঠেছে, মেয়েটের কোলে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে। বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করার দরকার মনে করি,—তুমি যেন সে বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন বলেই মনে হয়।"

কাজী সাহেব একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন "এই কথা? তা, বিয়ে দিলেই হবে,—চিন্তা করার নেই এ-তে কিছুই।"

হালিমা বিবি প্রকৃত মনোভাব স্বামীর মুখ হইতে বাহির করিতে না পারিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন "কথাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, পাত্র নির্ব্বাচন করে রাখা হচ্ছে গুরুতর কথা, তা'রপর না হয়, সুবিধামত কাজ করা যেতে পারে।"

কাজী সাহেব ভ্রূকুটি করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "তুমি ইসারায় দুনিয়ার সব বুঝে নাও,—আর এত বড় ব্যাপারের পরিসমাপ্তি কোথায় তা' বুঝে উঠ্‌তে পার না? এ হেঁয়ালী বলে মনে হয়! কথাটা স্পষ্ট করেই তবে বল্‌ছি,—এই ধর, বিয়ের বর যদি হোসেনই হয়,—তবে তোমার অমতের কি কারণ আছে?"

হালিমা বিবি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "মতামতের কথা কিছু হচ্ছে না,—আমার ইচ্ছার উপর কোন কিছু নির্ভর করে না। দুজনার যেরূপ মিল তা'তে এই বিবাহই বিশেষ প্রীতিপ্রদ হবে বলেই মনে হয়। তবে ওস্তাদজীর মত না নিয়ে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বলে মনে হয় না।"

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, নিতান্ত সহজভাবে বলিলেন "তাঁ'র মত আমি নিয়েছি। এ বিষয়ে তাঁ'র কোন আপত্তি নেই। হোসেন এ বয়সেই সমস্ত পরীক্ষাগুলি, বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পাশ করে ফেলেছে। বাদসা—খোদ, সেদিন আমাকে এর বিষয় বল্‌ছিলেন। তা'কে একটা ভাল চাকুরীতে ভর্ত্তি কত্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। চাকুরী হ'লে পরে বিয়ের বন্দোবস্ত করব মনে করেছি।"

হালিমা বিবি স্বামীর উক্তিতে একেবারে উৎফুল্ল হইয়া গেলেন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, কোমল কণ্ঠে বলিলেন "সে ভাল কথা। তবে ওস্তাদজী বড্ড কষ্ট করে, ঘরকন্না কচ্ছেন। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কচ্ছেন। এর কি

প্রতিকার করা যায় তাই সর্ব্বদা ভাবছি। আমার এখানে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্য, হোসেনকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলুম,— কিন্তু কোন ফল হয়-নি। তিনি নিতান্ত আত্মনির্ভরশীল লোক কি না,— কারো গলগ্রহ হ'তে চান না।

কাজী সাহেব চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বলিলেন "কথাটা আমিও যে ভাবি-নি এমন কথা নয়,—আমি একটা বন্দোবস্তও মনে মনে ঠিক করে রেখেছি,—এখন তুমি একমত হলে, সমস্যার সমাধান হতে পারে।"

হালিমা বিবি উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বলিল "কি ব্যবস্থা তুমি কত্তে চাও?"

কাজী সাহেব নিতান্ত সহজভাবে বলিলেন "আমিনাকে ওস্তাদজীর তত্ত্ব-তালাসের জন্য সেখানে রাখা যাক্। আমিনা ওস্তাদজীর খেদমত করবে,—শেষে হোসেন ও মতিয়ার বিয়ে হলে,—তাদের আশ্রয়ে থেকে সুখের মুখ দেখ্‌তে পারবে।"

হালিমা বিবি একগাল হাসিয়া বলিলেন "পরামর্শ মন্দ না হলেও,— বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। আমিনা বাল-বিধবা, বয়স পঁচিশ বছর হলেও,—ষোড়শীর মতই দেখায়। তা'র লাবণ্য-মণ্ডিত দেহ,— সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। তবে আমিনা কড়া শাসনে আছে বলে চরিত্র বজায় রেখেছে। ওস্তাদজীর ওখানে অবাধ মেলামেশার ফলে শেষটায় কোন কেলেঙ্কারী হবার আশঙ্কা আছে কি না,—বিবেচনা করে দেখ।"

কাজী সাহেব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন "তোমাদের ঐ এক রকম সন্দেহ সকলের উপরই যেন সমান ভাবে খাটাতে চাও। এই বুড়ো বয়সে আমাকে কি তুমি কম কড়া নজরে পাহারা দিচ্ছ? তুমি নিজ হস্তে আমার সমস্ত কাজ কর, তবু বাঁদিদের কোন কাজ

কত্তে দাও না—এটা মনে রেখো,—কাজী সাহেব আদর্শ চরিত্রের লোক। তাঁ'র শরীরের লাবণ্য অনেক যুবককেও পরাস্ত করে। ইচ্ছে কর্‌লে ওস্তাদজী অনেক ভাল পাত্রী সংগ্রহ করে "নিকে" কত্তে পাবেন। তা'র পুত্রগত প্রাণ,—পুত্রের কোন অনিষ্ট হতে পারে, এমন কাজে তিনি হাত দিবেন না। বিশেষতঃ সেদিন তাঁর মুখে যে সমস্ত মন্তব্য শ্রবণ করেছি, তা'তে এরূপ কোন আশঙ্কার কারণ আস্‌তে পারে বলে মনে হয় না। আর যদি তাঁর মত পরিবর্ত্তন হয়-ই, তা'তে আমিনার লোকসান কিছুই নেই। একটা ভাল লোকের আশ্রয় লাভ করে,—তা'র জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হবে। নিতান্ত অভিশপ্ত জীবনে সুখ শান্তি ফিরে পাবে।"

হালিমা বিবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন তা—অনেকটা ঠিকই বটে, তবে পুরুষ মানুষকে আমি ততটা বিশ্বাস কত্তে প্রস্তুত নই। তাঁরা মোহাবিষ্টে, বাঞ্ছিতাদের গ্রহণ করে, আবার কি ভাবে তাচ্ছিল্যের সহিত পরিত্যাগ করে, তার শত শত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের বক্ষে দেদীপ্যমান।"

কাজী সাহেব সহাস্য বদনে বলিলেন "এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই দোষ অনেকটা বেশী। তা'রা নানা উপায়ে পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করে, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের সুবিধা করে নেয়। শেষটায় পুরুষের রূপজ মোহ কেটে গেলে, বিষময় ফলই তা'রা ভোগ করে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বে কোন পুরুষই, কোন স্ত্রীলোককে বিপথগামী কত্তে পারে না, এটা ধ্রুব সত্য। সে কথা যাক্, ওস্তাদজীর মত নিয়ে, যা হয় একটা কিছু করা যাবে এখন,—কি বল?"

হালিমা বিবি বলিলেন "সে বেশ কথা, তিনি যদি এই বন্দোবস্ত অনুমোদন করেন, তবে আমি কোনই প্রতিবন্ধক দেখি না এর ভিতর—

তবে আমিনা, সে কোন দিনই আমাদের অবাধ্য হবে না, এটা সুনিশ্চিত।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন কাজী সাহেব, লোক মারফত, বৈরম আলীর নিকট পত্র লিখিয়া, তাঁহার বক্তব্য বিষয় অবগত করাইলেন এবং আমিনাকে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা সম্বন্ধে, তাঁহার অভিমত জানাইতে অনুরোধ করিলেন।

বৈরম আলী সমস্ত দিন নির্জ্জনে বসিয়া, তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিল। পরস্পর বিরোধী নানা চিন্তার প্রবল ধারা তাহার অন্তরে উঠা-নামা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রস্তাবিত বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করিলে, জনসাধারণের চক্ষে বিষ-দৃশ্যের সৃষ্টি করারই সম্ভাবনা, অধিকন্তু পরিচর্য্যা-নিরতা আমিনার অবাধ মেলামেশার অধিকারের ছলে এবং তাহার বয়সের মোহময় যৌবনসুলভ আকর্ষণের প্রভাবে, তাহার অন্তরের প্রতি পর্দ্দায় একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট আশঙ্কা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই বিপরীত পথানুবর্ত্তী অবস্থার প্রতিকূলে, কতটুকুন দৃঢ়তার সহিত সে আপনাকে সংযত করিতে সক্ষম হইবে? এরূপ একটা জটিল সমস্যা পূরণের মত অবস্থা, তাহার জীবনে যেন আর কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই।

যদি কাজী সাহেবের প্রস্তাব একেবারে সে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তিনি হয়-ত তাহাকে নিতান্ত লঘুমনা, দুর্ব্বল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন জন-তন্ত্রীর মধ্যে টানিয়া লইয়া, একেবারে অসংযমী ও খেলো বলিয়া

ধারণা করিবেন-ই। কাজী সাহেব হয়-ত তাহার অন্তর্নিহিত আত্মনির্ভরশীল-শক্তি, চিত্তের ধৈর্য্যতা এবং তাহার মুখ-নিঃসৃত যুক্তিপূর্ণ উক্তির ভাব-প্রবণ তৎপরতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াই, এত বড় একটা জটিল মনোবিজ্ঞানের ঘূর্ণাবর্ত্তের সংস্পর্শে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে শঙ্কা বোধ করেন নাই!

তাহার পক্ষে যে কারণেই হউক, একেবারে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মত, দুর্ব্বলতার পরিচায়ক আর কিছুই হইতে পারে না। তাহার এই পনর বৎসরের শিক্ষা, দীক্ষা, চিত্ত-সংযমতা, সামান্য যুবতীর রূপ-মোহের কর-কবলে পড়িয়া, নিতান্ত তৃণের মতই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে? আর সে তাহার অন্তরের সমস্ত বিবেক হারাইয়া, পুঞ্জীভূত সমস্ত অতীত-স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া, আপনাকে এম্‌নি নির্ম্মমভাবে অপরের করায়ত্ব করাইয়া দিবে? না—ইহা কথনও সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহাকে এই স্রোতের তোড়, বুকে টানিয়া লইয়া, মনুষ্যত্বের অসীম প্রভাব বিস্তার করাইতেই হইবে। পরীক্ষা, মানুষকে খাঁটি জিনিষ উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেয়, চিত্তবৃত্তিকে ভালরূপ বুঝিয়া লইবার অধিকার দেয় এবং স্খলন-সঙ্কুল-পথে অগ্রসর হইতে, অন্তরে কতটুকুন শক্তির প্রয়োজন হইবে তাহার একটা মাপকাঠি গড়িয়া লইবার অবকাশ করিয়া দেয়। এইরূপ শতমুখী দুর্দ্দমনীয় চিন্তার প্রেরণার ভিতর দিয়া, কাজী সাহেবের প্রস্তাব অনুমোদন করাই যে নিতান্ত শ্রেয়ঃ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, বৈরম আলী,—কাজী সাহেবকে পত্র লিখিল।

কাজী সাহেব বৈরম আলীর সম্মতিজ্ঞাপক চিঠি পাইয়া, অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং সময়োপযোগী উপদেশ প্রদান করিয়া, আমিনাকে বৈরম আলীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

দিন কয়েকের মধ্যে আমিনা স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে এবং সুনিপুণ করস্পর্শে সেই ছন্নছাড়া সংসারকে বেশ সুন্দরভাবে গুছাইয়া লইল। ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, আমিনা বৈরম আলী ও হোসেনের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহাদের অভাব, অভিযোগ বিদূরিত করিবার জন্য আমিনা, নীরব কর্ম্মীর মত, এক পায় খাড়া থাকিত! সময়োচিত প্রয়োজনীয় বস্তু করায়ত্ত করাইয়া দিয়া, আমিনা দুইটী মাসের মধ্যেই তাহাদের অন্তরে, অসীম প্রভাব বিস্তারের সুবিধা করিয়া লইল। বৈরম আলী নিতান্ত নির্লিপ্তের মত, আমিনার পরিচর্য্যার প্রতি সূত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহার অভিমতানুযায়ী আপনাকে পরিচালিত করিত। আমিনার আগ্রহাতিশয্যে ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করিয়াই, বৈরম আলী আপনার সমস্ত দায়িত্ব কাটাইয়া ফেলিত। বৈরম আলী সংসার পরিচালনের সমস্ত ভার আমিনার উপর অর্পণ করিয়া, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, নির্জ্জন নদীতীরে উপবেশন করিয়া, স্বীয় প্রাণ মাতান স্বর-লহরী দিগন্তে মিশাইয়া দিয়া, আপনাকে মস্‌গুল করিয়া রাখিত।

আমিনা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পিতা নাছিরজঙ্গ ঐ অঞ্চলে একজন বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু তাহার চরিত্রগত দোষে এবং অমিতব্যয়িতার ফলে, পৈত্রিক সঞ্চিত অর্থ ও জমিজমার, অনেকটা হস্তচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়া, একমাত্র কন্যা আমিনাকে লইয়াই, অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। আমিনা আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতাকে হারাইয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মৃত্যু সময় নাছিরজঙ্গের যে সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ব

ছিল,—তাহার সমস্তই দেনার দায়ে পাওনাদারের করতলগত হইয়া গেল। হালিমা বিবি আমিনার এই নিঃস্ব অবস্থা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, তাহাকে নিজের সংসারে আশ্রয় দিলেন। শেষে তিন বৎসর পর এক দরিদ্র যুবকের সহিত আমিনার বিবাহ দিয়া, উভয়কেই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আমিনা বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই স্বামীহারা হয়,—কন্যা-স্নেহে প্রতিপালিতা হইয়া আমিনা কাজী সাহেবের সংসারেই বাস করিতে লাগিল। হালিমা বিবির কড়া শাসনে আমিনা স্বীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। হালিমা বিবির বিশেষ যত্নে, আমিনা লেখাপড়া ও অন্যান্য সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছিল। উপযুক্ত সুপাত্রের অভাবে, আমিনার দ্বিতীয়বার বিবাহের সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৈরম আলী পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেও তাহাকে একজন সুশ্রী যুবাপুরুষ বলিয়া ভ্রম হইত। তাহার বলিষ্ঠ দেহ, তেজব্যঞ্জক চাহনিতে সকলকেই মুগ্ধ করিত। তাহার শান্ত স্থির, ধীর ব্যবহারের প্রভাবে শত্রু বলিয়া তাহার কেহই ছিল না।

আমিনা চল-চঞ্চল-গতিতে বৈরম আলীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া আরও ছয় মাস কাটাইয়া দিল। এই অল্পকালের মধ্যে এক পরিম্লান আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় আমিনার অন্তর সুখ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এক মোহময় উন্মাদনা তাহার বুকের ভিতর, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতই প্রবাহিত থাকিয়া, কূলপ্লাবী চাঞ্চল্যের প্রভাবে তাহাকে উৎসবময়ী করিয়া দিত। বৈরম আলী যখন নির্জ্জনে বসিয়া

তাহার সঙ্গীত চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিত, আমিনা নীরবে দাঁড়াইয়া, সুরের মাধুর্য্যে, গমক, মীড় ও মূর্চ্ছনার, পরিপূর্ণ মধুরতম সঙ্গীত সুধা-তরঙ্গে, আত্মহারা হইত, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অতৃপ্ত অন্তরে নব উন্মেষণ জাগাইয়া তুলিত। সে অনিমেষ নয়নে কেবল বৈরম আলীর মুখপানে তাকাইয়া থাকিত এবং জীবনের এক পুণ্যময়ী গোধূলী লগ্নের আশায় তাহার মধু-যৌবনের ফেনোচ্ছ্বাস, উগ্র দ্রাক্ষারসে পরিণত হইত। বৈরম আলীর রূপ, গুণ, বিদ্যা এবং অন্তরের কোমলতা যেন তাহার অন্তরে স্থায়ী মাদকতার সৃষ্টি করিত। তাহার জীর্ণ জীবনের মাঝখানে, সহসা কোথা হইতে যেন "রোমান্স"এর একটা তাজা রঙ্গীন পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত।

আমিনা সেই মঞ্জু আগমনী, রুদ্র দীপকে আত্মগোপন করিয়া, নিতান্ত সহজভাবে আপনাকে পরিচালিত করিত। তাহাতে ব্রীড়া ছিল না, লজ্জা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না, নিজের ললিত মধুর হাস্যে নিজেই মুখর হইয়া, নূতন তালে ভরপূর হইয়া উঠিত। আকাশ আলোক-বীজের ভিতর, ভাবী লতিকাকে যে ভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, দক্ষিণ পবন দ্বারে কাণ পাতিয়া, কুঁড়ির গর্ভশয্যায় রুদ্ধ গন্ধ যেমনি খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে, আমিনাও যেন সেই মহাসিন্ধুর মেঘমন্দ্রের স্বর শ্রবণ করিয়া, গতিহীন, ক্রীয়াশীল জীবনকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। সে যেন সহসা পাষাণকারা চূর্ণ করিতে ব্যস্ত হইয়া, করুণাধারায় ইপ্সিতের অন্তর প্লাবিত করিতে ছুটিয়া চলিতে চাহিত! তাহার যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা অন্তরের অমূল্য অর্ঘ্য—তাহাই যেন ঢালিয়া দিতে চাহিত,—উদ্দাম প্রমত্ত,—অঙ্গ-গতিতে সেই বাঞ্ছিতের উদ্দেশে! সংসারের রক্ত চক্ষু, অনুশাসন, কিছুতেই যেন সেই গতি সংযত করিতে পারিতেছিল না। সে বুঝিয়াছিল,—জীবনের পূর্ণ বিকাশ, অসীম

বন্ধের ভিতর স্ফুটতর হয় না,—হয় করায়ত্বের ভিতর, সুপ্তির ভিতর হয় না,—হয় জাগরণে, মোহ অজ্ঞতার অন্ধকারে হয় না,—হয় জ্ঞানের অরুণালোকে !

আমিনা বৈরম আলীর আহ্বানে সমস্ত কাজ ফেলিয়া ত্বরিত-পদে ছুটিয়া যাইত,—কিন্তু চোখে চোখে পড়িতেই আড়ষ্ট নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তাহার আদেশবাণী শ্রবণ করিত। বৈরম আলীর তৃপ্তি সম্পাদন করাইবার ভিতর, এক তৃপ্তির অনুভূতি জাগরিত হইয়া, তাহাকে একেবারে অসীম সুখ-তরঙ্গে টানিয়া ফেলিয়া দিত। রাত্রিতে বৈরম আলী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলে, আমিনা ধীরে ধীরে তাঁহার শিয়রে উপবেশন করিয়া বাতাস করিতে থাকিত। অনেকদিন বাতাস করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে, তাহার দেহলতা, শিয়রের একপার্শ্বে লুটাইয়া দিয়া, সুষুপ্তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিত। কোন দিন আবার বৈরম আলীর আহ্বানে জাগ্রত হইয়া, লজ্জায়-রাঙ্গা হইয়া উঠিত এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের শয্যার আশ্রয় লইয়া, বিনিদ্র অবস্থায় অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দিত। কি এক অসীম ভাবের প্রেরণায় আমিনার ক্ষুধিত চিত্ত যেন বৈরম আলীর ছায়া অনুসরণ করিয়া, তৃপ্তি অনুভব করিত।

বৈরম আলী নিতান্ত সহজ ও সরলভাবে আমিনার সহিত কথা কহিত। তাহার ভিতর না ছিল মাদকতা, না ছিল ভাবপ্রবণতা, না ছিল সঙ্কোচতা—যেন আপন ভাবে বিভোর চিত্ত লইয়া, সেই অসীমস্রষ্টার চরণতলে, আপনাকে বিকাইয়া দিবার জন্য আত্মপ্রসারণ করিত। যাহা না করিলে নয়, যাহা তাহার মত অবস্থাপন্ন লোকের ন্যায্য প্রাপ্য তাহার বেশী কিছু আমিনাকে করিতে দেখিলে বৈরম আলী সঙ্কোচ বিহ্বলচিত্তে বাধা প্রদান করিত।

বৈরম আলী হোসেনকে স্নেহ-দৃষ্টিতে প্রতিপালন করিতে, আমিনাকে অনুরোধ করিত। যাহাতে হোসেন, কোন অভাব অসুবিধা অনুভব না করে, তাহার চেষ্টাই যে একমাত্র তাহাকে সুখ-প্রদীপ্ত করিতে পারিবে, বৈরম আলী, আমিনাকে প্রকারান্তরে তাহাই বুঝাইয়া দিত। আমিনা তাহার অন্তরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া, হোসেনের পরিচর্য্যায় রত থাকিত, তাহার সেই অসীম যত্নের ফলে, হোসেন অল্পদিনের মধ্যেই আমিনাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিল। আমিনার অন্তরের সুপ্ত মাতৃত্বের ক্ষীণ স্পৃহাটুকুন, তাহাকে ওতপ্রোতভাবে ছাইয়া ফেলিয়া, শতমুখী হইয়া হোসেনকে বেষ্ঠন করিত। হোসেন সেই অপ্রত্যাশিত স্নেহ ও আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইয়া, তাহার মস্তক, কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ, আমিনার পদপ্রান্তে লুটাইয়া দিত।

বৈরম আলী একদিন আমিনাকে সম্মুখে পাইয়া, স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে বলিল "আমিনা! তুমি আমাদের জন্য প্রাণপ্রাত করে, সেবা কচ্ছ। এর জন্য আমরা তোমার নিকট চিরঋণী। এর প্রতিদান দেবার ক্ষমতা-ত আমাদের নেই।"

আমিনা নম্র-স্বরে বলিল "প্রতিদানের আশা নিয়ে কোন কাজ করলে তৃপ্তি ও আস্বাদ কোন দিনই পাওয়া যায় না। তোমাদের পরিচর্য্যা করেই আমার সুখ, তোমাদের মুখে শান্তির জ্যোতিঃ দেখলেই আমার অন্তর সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই একমাত্র অসীম দান ভগবানের নিকট হ'তে লাভ করে, আপনাকে কৃতার্থ মনে কচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই কর্ম্মকুশলতা নিয়ে, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে, এই অভিশপ্ত জীবন অতিবাহিত করে যেতে পারি!"

বৈরম আলী মুগ্ধ-নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল। আমিনার মুখ-নিঃসৃত প্রতি কথার ঝাঁজে, বুকফাটা একটা আর্ত্তনাদে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। বৈরম আলী অতি কষ্টে চোখের জল রুদ্ধ করিয়া, নির্জ্জন নদীর ধারে বসিয়া, সুরের ঝঙ্কারে নির্জ্জন প্রান্তর মুখরিত করিয়া, গান ধরিল এবং সেই ভাবের প্রেরণায়, আপনাকে তন্ময় করিয়া ফেলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পাহারের অন্তরালে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িলেও, পার্শ্বের নদীবক্ষে সমুত্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের বক্ষোদেশে, অপরাহ্নের আলোকরাশি তখনও ম্লান হইয়া আসে নাই। বৈরম আলী আঙ্গিনার বাহিরে, বাগানের সংলগ্ন, নদীর ধারে, একাকী উপবেশন করিয়া, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত, বহুদূর প্রসারি কণ্ঠস্বরে, বিচিত্র ভাব-বিন্যাসের সহিত, ফিরাইয়া ঘুরাইয়া, নানারূপে, গান গাহিয়া, থামিয়া গেল। সঙ্গীতের প্রতি ছত্র, সে এম্নি সুকৌশলে, রোমাঞ্চকর ভাব-প্রবাহের সঞ্চার করিল যে, পার্শ্বের পথবাগী পথিকগণও সমাহিত চিত্তে, সেই সুরের মীড়, মূর্চ্ছনার শেষ তালকে, নত মস্তকে অভিনন্দন করিল।

আমিনা এতক্ষণ নীরবে একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া, সেই সঙ্গীত-সুধা-তরঙ্গে ডুবিয়া, ভাসিয়া যেন এক অভিনব সঙ্গীত-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গান শেষ হইলে আমিনা কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মস্তক উত্তোলন করিল। পর মুহূর্ত্তে বৈরম আলীর কৌতুক-বিহ্বল-দৃষ্টিও আমিনার বিস্ময়-বিধুর বক্ষের উপর নিপতিত

হইল। আমিনা নিতান্ত অপ্রতিভের ন্যায়, আরক্ত নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি নত করিয়া, দ্রুত চরণে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বৈরম আলীর অন্তর সহসা এক নূতন অব্যক্ত-ভাবের ঝাঁজে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যে অতীত স্মৃতির মোহে, বৈরম আলী আপনাকে বিশ্বের সমস্ত মন মাতানো সৌন্দর্য্য ও চিত্ত-বিভ্রমের হাত হইতে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা যেন আমিনার ভাব-প্রস্রবণের প্রবল-ধারার নিকট প্রতিহত হইয়া, তাহার সমস্ত সংকল্প নষ্ট করাইবার উপক্রম করিয়াছিল। বৈরম আলী কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া, ভাবিতে লাগিল, আমিনা—কে? আমার সেবা-নিরত, একজন পর স্ত্রী বৈ-ত নয়! যতক্ষণ সে আমার সেবায় নিযুক্ত থাকিবার অধিকার পাইবে,—ততক্ষণ সে আমার ছোট্ট পরিবারভুক্ত একজন আগন্তুক মাত্র! যে দিন তাহাকে পরিচর্য্যার ভার হইতে মুক্ত করিব, সেদিন আমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। এই ক্ষণিক মেলামেশার ভিতর দিয়া, দাবী দাওয়ার মত কোন স্মৃতিরেখা পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারিবে, এরূপ মনে হয় না। ভেসে চলে যাওয়ার মত—একটা ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া, যেটুকু স্নেহের আদান প্রদান চলিতেছে, সে কেবল পথচলা পাথকের পক্ষে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহার বেশী কিছুই নাই। সে যেন ব্যাকুল আগ্রহে, শুভ্র কিরণের মতই তাহার হৃদয়ের অনাবিল স্নেহরাশি, দুই হাতে বিলাইতে চাহে। সে যেন চাঁদনী রাতের উদাসী বালু-বেলার ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার—মায়াবিনী! আরাম ও আয়েস জিনিস, আমিনা এত বেশী করিয়া আমার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছে যে, ইহার ফলে আমার নিজের পক্ষে পরিশ্রম করিবার অভ্যাস, যেন একেবারে ভুলিতে বসিয়াছি। আমি জীবনের

নবম পরিচ্ছেদ

সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য যেন ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছি। আমার মনে হয়, আমার এই সাংসারিক কার্য্যের একান্ত নির্লিপ্ততার প্রভাবে, জীবনের সমস্ত উচ্চ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা—সবই অতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে। বয়সের প্রভাবে, আমিনার অন্তরের ভিতরে যেটুকুন চাঞ্চল্যের সাড়া আনিয়া দিয়াছে, তাহা সুধু ক্ষণস্থায়ী এবং একটা সাময়িক মাদকতার মোহময় উত্তেজনা। কাজী সাহেবের বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত তাহার অন্তরের সমস্ত স্মৃতির বাঁধ ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমিনা প্রাণপণে আমার পরিচর্য্যা করে, আমার তৃপ্তি সম্পাদন করাইতে পারিলেই যেন সে শান্তি অনুভব করে,—ইহার ভিতর প্রতিদানের মত কোন কিছু লাভ করা তাহার ভাগ্যে কোন দিনই ঘটিয়া উঠিবে না,—তাহা সে ধারণা করিতে সক্ষম কি না—জানি না। আমার অন্তর এই প্রলোভনে আলোড়িত হইলে,—পরিণাম অশুভকর বলিয়াই মনে হয়। আমাকে এই অবাধ মেলামেশা প্রত্যাহার করিতেই হইবে! কতক গোপন অস্বস্তির অস্পষ্ট ছায়া, কত-না বিরাগের নিপুণ ছদ্ম-বেশ, যেন একত্র হইয়া, আমার চারিদিকে উঁকি মারিতেছে। আমার অন্তরের দৃঢ়সঙ্কল্প এম্‌নি করিয়া স্নেহের মোহে মথিত করিতে দেওয়াকে,—আমি কর্ত্তব্য সম্পাদনের একটা মস্ত প্রতিবন্ধক মনে করি! না,—এই মন মাতানো প্রবল তরঙ্গে আপনাকে এম্‌নি নির্ম্মমভাবে ভাসাইয়া দিতে কিছুতেই পারি না!

পরদিন বেলা সাতটায় আমিনা, বৈরম আলীর প্রাতঃরাশের সামগ্রীগুলি বিশেষ যত্নের সহিত তাহার সম্মুখে সজ্জিত করিয়া দিয়া একপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। বৈরম আলী স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে ডাকিল "আমিনা"।

আমিনা স্থির-দৃষ্টিতে বৈরম আলীর প্রতি তাকাইয়া বলিল "কি—ওস্তাদজি!" আমিনা বৈরম আলীকে এই নামেই ডাকিত।

বৈরম আলী অন্তরের সমস্ত দ্বিধা শঙ্কা বিসর্জন দিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিল "আমিনা! তুমি আমাকে খুবই যত্ন কচ্ছ, এতটা যত্ন জীবনে বোধ হয় লাভ করার সুবিধা আমার আর ঘটে উঠে-নি। তোমার অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিদান কর্‌বার ক্ষমতা বোধ হয় আমার নেই। তুমি যে এম্‌নি করে প্রাণপাত করে আমার সেবা কচ্ছ,—এতে তোমার লাভালাভ যে শূন্য,—তা বোধ হয় বুঝে দেখ্‌তে চেষ্টা কর-নি।"

উক্তি শ্রবণ করিয়া আমিনার নয়নযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আমিনা বলিল "জগতে লাভালাভ বিচার করে যা'রা কোন কাজে হাত দেয়,—তা'দের ফল ভাল ও মন্দ দুই হয়ে থাকে, অন্ততঃ ব্যবসাদারের পক্ষে অনেকটা তাই মনে হয়। আর যা'রা মন্দের দিকটা অনুধাবনা কর্‌বার শক্তি হারিয়ে—অন্তর যা' চায়, যা'তে পরিতৃপ্তি লাভ কত্তে পারে, তাই নিয়ে মসগুল হয়ে থাকে, তাদের উদ্যম, অপ্রতিহত বলেই মনে হয়,—মস্ত প্রতিবন্ধক সম্মুখে এসে, দাঁড়ালেও, আন্তরিক যত্নের ফলে, তা'দের গতিরোধ করা যায় না। তটিনীর প্রবল ধারা,—সাগর সঙ্গমের আশায়ই,—উত্তাল হয়ে ছুটে চলে। তোমার ঘরকন্নায় নিযুক্ত হয়েছি,—এটা মনে হয়, ভগবানের দান,—তোমার সেবা করে পরিতৃপ্ত হচ্ছি, এও বোধ হয় তাঁ'রি প্রেরণায়। লাভালাভ চিন্তা কর্‌বার মত অবস্থা আমার এখনও এসে দাঁড়ায়-নি

বৈরম আলী আমিনার মুখের প্রতি কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকাইয়া বলিল "এ যদি তোমার অন্তরের কথা হয়,—তবে আমার অনুমান মিথ্যা নয়,— । আমি জানি—আমি তোমার কোনই কাজে আসতে

পার্ব না,—আমা হ'তে তোমার কোনই তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা নেই,—তাই জেনে শুনে,—আমি তোমাকে প্রতারণার পথ হতে মুক্ত কত্তে ইচ্ছা করেছি। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি,—আমার জীবনপ্রবাহ পরিবর্ত্তন করার মত,—শক্তি আমার নেই। এই একমাত্র পুত্রকে সম্বল করে, জীবন প্রবাহ বিস্তার করেছি, এ নিয়েই জীবন যাত্রা শেষ কর্‌ব। আমি যা' হারিয়েছি শত চেষ্টায়ও সে স্থান পূরণ কত্তে সক্ষম হব না। অন্তরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় যে দাগ পড়ে গেছে,—তা মুছে ফেলা,—আমার পক্ষে যেন এক রকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। ভগবান্ প্রেরিত সেই দুঃখের দানই বুকে করে, বাকী জীবনটা কাটাতে চাচ্ছি। এর মধ্যবর্ত্তী অন্য কোন স্নেহের টানকে,—মস্ত একটা অভিসম্পাত বলেই মেনে নিতে চাই! পথ-হারার মত ঘুরে মরার হাত হ'তে তোমাকে রক্ষা করবার জন্যই, আজ আমি এতগুলি কথা বল্‌তে বাধ্য হয়েছি। দেবতা তৃপ্ত হতে না চাইলে,—সমস্ত পূজার আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়।"

বৈরম আলীর উক্তির আঘাতের প্রবলতায় আমিনার রোদন-বিবশ-চিত্ত যেন সহসাই সুগভীর অভিমানে তপ্ত হইয়া উঠিল। আমিনার রহস্যময়ী মূর্ত্তি, তেমনি পদানতা, অঞ্জলিবদ্ধা থাকিয়াই,—গভীর হইতে গভীরতর ভাব ধারণ করিল। সঘন শ্বাসে তাহার বুক তখন জোয়ার লাগা নদীতরঙ্গের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আমিনা—শব-শুভ্র-রক্তহীন মুখে, তীব্র কটাক্ষ বিস্তার করিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিল—"দেবতাকে পূজা করার অধিকার সকল মানুষেরই রয়েছে,—সেই পূজার ভিতর দিয়ে স্বার্থের পূতিগন্ধ নিঃসরণ হ'লে, দেবতার পূজায় সাফল্যের আশা কোন দিনই আস্‌তে পারে না। পূজার বিনিময়ে একটা কিছু লাভ করার আশা,—আর ঘুষ দিয়ে কার্য্য

উদ্ধার করার তৃষ্ণা,—একই সূত্রে গ্রথিত বলে, এরূপ প্রবৃত্তি চিরদিনই ঘৃণিত বলে মনে হয়। দেবতা সন্তুষ্ট কি রুষ্টই হলেন, তার প্রতি লক্ষ্য না রেখে, প্রাণের তৃপ্তি লাভ কত্তে যেয়ে, নিখুঁতভাবে ভক্তির প্রবল ধারা প্রবাহিত করার ভিতর, দাবী দাওয়া বলে একটা কিছু মনে না রাখাই মঙ্গলকর। তোমার সেবার অধিকার পেয়েই,—আমার অভিশপ্ত জীবন, এই একমাত্র পাথেয় সাথে করে, অসীম পথের যাত্রীর মত ছুটে চলেছে, এর শেষ যে কোথায়, তাও ভেবে দেখ্‌তে চেষ্টা করে-নি।"

বৈরম আলী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "তুমি যা বল্‌ছ সে হল,—তোমার আত্ম পরিতৃপ্তির কথা। চিন্তা করে দেখ, আমার লক্ষ্যপথ ধরে চলার পক্ষে,—এটা কত বড় বাধা! তুমি একটা মিথ্যা মরীচিকার পিছন ধরে মৃগ-তৃষ্ণিকার সৃষ্টি করে ঘুরে মরবে,—এটা বিশেষ সমীচীন বলে মনে হয় না। তুমি কাজী সাহেবের বাড়ী ফিরে যাও, আবার তোমার জীবনের ধারাগুলি পূর্ব্বের ন্যায় পরিবর্ত্তন করে, সুখী হতে চেষ্টা কর। এ আমার শেষ অনুরোধ,—রক্ষা করবে কি?"

মুহূর্ত্তেই আমিনা তাহার বিরাগপূর্ণ দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইল। ক্ষণকাল তাহার ভাল করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের শক্তি রহিল না। নিখিলের সমুদায় বেদনা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিল। বৈরম আলীর উক্তিতে, তাহাকে এক সঙ্গে ক্রুদ্ধ, শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত করিয়া তুলিল। বিষের বাণের ফলার মতই, সেই কথাগুলি যেন, তাহার বুকের ভিতর, কাটিয়া ফেলিয়া, শতধা করিয়াছিল এরূপ অনুভব করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল,—কাজী সাহেবের ওখানে ফিরে যাব? তাতে আমি শান্তি ফিরে পাব? তা—কোন দিনই হবে না,—

নবম পরিচ্ছেদ

অন্তরের আগুন নির্ব্বাপণ করবার উপাদান সেখানে সংগ্রহ কত্তে পার্‌ব বলে মনে হয় না, মনটার একটা আকর্ষণীয় খোরাক মানুষমাত্রেরই-ত চাই। অন্তরের আশা, আকাঙ্ক্ষার একটা স্বাভাবিক নিবৃত্তির পথ খুঁজে বের কত্তে না পারলে, আমার পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাই যে নিতান্ত অসম্ভব! কাজী সাহেবের বাড়ীর কয়েদখানার আদব-কায়দার হাতকড়ি বেঁধে, একঘেয়ে জীবন কতদিন পরিচালনা করা যেতে পারে? আমিনা—পর মুহূর্ত্তে, মধুরক্লিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি যদি না যাই—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে? আমি যদি তোমার পরিচর্য্যা কর্‌বার অধিকার না ছেড়ে যাই, তা হ'লে তুমি আমাকে জোর করে বঞ্চিত কর্‌বে? তোমার ভিতর এতটুকুন প্রাণের সাড়াও কি আমি আশা কত্তে পারি না?" বলিয়া আমিনা নীরব হইল। অশ্রুজলে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া গেল। সে অতি কষ্টে আত্মস্থ হইয়া বলিল "ওস্তাদজি! তুমি মনে রেখো,—প্রাণ গেলেও তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দোব না। রুদ্রের ভিতর ধ্বংসের শক্তি রয়েছে বলেই কি,—তা'কে ক্রীড়নক করে তুল্‌তে হবে? আমি প্রাণপণে আপনাকে সংযত করে, একেবারে নির্লিপ্ত হতে আত্মপ্রসরণ কর্‌ব। তবু তুমি আমার এই অধিকার হতে বঞ্চিত কত্তে চাইবে? বল—ওস্তাদজি!"

বৈরম আলী কয়েক মিনিট নীরবে বসিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল —এর পরিণামে—পদস্খলন অনিবার্য্য। আমি যতই আপনাকে—এই মোহ হতে সরিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করি না কেন, এত বড় শক্তির মোহোন্মাদক প্রলোভনের নিকট পরাস্ত আমার স্বীকার কত্তেই হ'বে। যা'রা আমাকে সংযমী মনে করে, এতদিন আমাকে ভক্তি কত্ত, শ্রদ্ধাঞ্জলি বিতরণ করে উচ্চ প্রশংসা কত্ত, তা'রা যে আমার প্রতি

শ্রদ্ধা হারায়ে, বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত কত্তে দ্বিধা বোধ করবে না।
অতঃপর বৈরম আলী বলিল "প্রকৃত পক্ষে তোমাকে তাড়িয়ে দিবার কথা এতে আসতে না পারলেও, তুমি এখানে থাকলে, আমার অস্বস্তি অনেক বেড়ে যাবে, স্বাভাবিক মনোবৃত্তির সহিত যুদ্ধ কত্তে যেয়ে আমাকে পদে পদে অপদস্ত হ'তেই হ'বে, এমনও হতে পারে, হয়-ত তোমাকে বিনাদোষে অনেক অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ কত্তেও হবে।"

উক্তি শ্রবণ করিয়া আমিনা শব-বিবর্ণ মুখে, থরকম্পিত দেহে মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তর এমনিভাবে মথিত হইল যে, আকাশের বজ্র অকস্মাৎ খসিয়া পড়িলেও, হয়-ত তাহাকে এমনিভাবে বিস্ময়-বিহ্বল করিতে পারিত না। সে ভাবিতে লাগিল সংসারে যে দাবীহারা—তা'র পক্ষে আশায় উদ্বুদ্ধ হতে চেষ্টা করা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র। এতে যদি সে সুখী হয়, আমি তা'র পথে কেন কণ্টক হ'তে যাব? আমি তা'র কে? নিতান্ত পর,—এ ছাড়া আর কিছুই যে নয়? আমি তা'র পর? এ কথা ভাবতেও যেন অন্তর শতধা হয়ে ছিন্ন হতে চায়। হায়! সে যদি জানত,—তা'র স্মৃতির একটি কণা, আমার অন্তর, সতেজ করে তুলে, তা হ'লে কি আমাকে এমনি করে বিদায় কত্তে চাইত? হায়! স্ত্রীলোক—কত অসহায়া! সৃষ্টির চাকা তাদের বুক পিষে, ঘুরেই চলছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, তাদের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখের ধারও ধারে না—তবু তা'রা এখানে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়, কি—ভ্রম! স্নেহ বল, ভালবাসা বল—এ যেন বিদ্যুৎ চমকের মত এতটুকুন আলো দিয়ে, মিলিয়ে যাওয়ার মতন, আলোক আঁধার দিয়ে লুকোচুরি খেলান, এর শেষ কোথায়? এই আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা, উদ্যমে গড়া উৎসবের খেলাঘর

এসব এত বড় মিথ্যা,—এত বড় ফাঁকি! আমিনা কোনই প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরবে দাঁড়াইল এবং দ্রুত-চরণে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা দৈনন্দিন কার্য্যের ন্যায়, বৈরম আলীকে ও হোসেনকে আহার করাইয়া, স্বয়ং আহার করিল। শেষে ঘরের সমস্ত তৈজসপত্র বস্ত্রাদি বিশেষ যত্নের সহিত যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া, অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সমাধা করিল। ক্রমে চারিটা বাজিল, আমিনা তাহার নিজের সামান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি স্কন্ধে সংস্থাপন করিয়া, বৈরম আলীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, জড়িতকণ্ঠে বলিল "ওস্তাদজি! তবে এখন আসি, কোন অপরাধ করে থাকলে ক্ষমা করো!" আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া আমিনা, হোসেনকে সঙ্গে করিয়া, কাজী সাহেবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

আমিনার গমনকালীন আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া, বৈরম আলী একেবারে মুসড়িয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, আমিনার হাত ধারণ করিয়া তাহাকে বলে "তোমাকে আর যেতে হবে না—এখানেই থাক।" কিন্তু শত চেষ্টায়ও তাহার বাক্যস্ফুরণ হইল না।

আমিনা চলিয়া গেল, বৈরম আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, নদীর ধারে যাইয়া উপবেশন করিল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, আলো ও আঁধারের লুকোচুরি চলিতে লাগিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় সম্মুখের প্রান্তর—নদীর উজ্জ্বল জলরাশি, রজত ধারায় প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল। বৈরম আলী নীরবে বসিয়া, অসীম চিন্তার সাগরে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণ মাস, দ্বিপ্রহর হইতেই বারিপাত হইতেছিল,—বর্ষণক্লান্ত সজল-কাজল মেঘগুলি, ছন্নছাড়ার মত ছুটাছুটি করিতেছিল। সূর্য্যদেব মেঘের কোণা ভাঙ্গা ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলিয়া, অলস মন্থরগামী মেঘের বুকে, আলোক আঁধারের বৈচিত্রপূর্ণ, সোণালু-রশ্মির পরশ মাখাইয়া, দীপ্ত ঝল্‌ঝল্‌ রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছিল। ক্রমে চারিটা বাজিতেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, সূর্য্যদেব অস্তপাটে যাইয়া, সপ্তরঙের ঘুড়ি উড়াইয়া, মেঘের বুকে রামধনু অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

কাজী সাহেবের আঙ্গিনার সম্মুখের সজ্জিত সুন্দর বাগানে, মতিয়া একটি রঙীন প্রজাপতির মত, তাহার ধানি রঙের চঞ্চল-অঞ্চল উড়াইয়া, একাকী পদচারণা করিতেছিল। তাহার মুখ চিন্তা ম্লান, চরণের গতি শ্লথ, চিত্ত যেন গভীর চিন্তাভারে, কোন্ অতলে তলাইয়া গিয়াছিল। দুশ্চিন্তার চিহ্ন তাহার ভ্রূযুগলের কুঞ্চন ও নেত্রের অগ্নিদীপ্তি হইতেই প্রকটিত হইতেছিল। বাগানের অনতিদূরে দীঘী, তাহার জল যেন স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। বাগানের স্থানে স্থানে ঝোপের আড়ালে, বসিবার উপযোগী শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত বেদিগুলি, সাদা ধব্‌ধবে আস্তরণের মতই শোভা বিস্তার করিতেছিল। মতিয়া জনশূন্য, শব্দশূন্য, কাননভূমে কতক্ষণ পর্য্যন্ত পদচারণা করিয়া, একটি বেদির উপর যাইয়া উপবেশন করিল এবং দক্ষিণ হস্তে মস্তক সংন্যস্ত করিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল।

ঠিক এম্‌নি সময়ে হোসেন মতিয়ার সম্মুখীন হইয়া ডাকিল —"মতিয়া!"

দশম পরিচ্ছেদ

মতিয়া বিস্ময়-হর্ষ-বিক্ষুব্ধ-চিত্তে, পশ্চাতে ফিরিয়া, লাজ-অলস-আঁখি মেলিয়া হোসেনের প্রতি তাকাইল, পর মুহূর্ত্তে হোসেনের সম্মুখীন হইয়া, তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্তে ধারণপূর্ব্বক, অনুযোগপূর্ণ অভিমানের সহিত, কোমল কণ্ঠে বলিল "বেশ্ লোক তুমি কিন্তু যা-হক্! এ দু'দিন তুমি কেন আস-নি—বল দিকিন্? আমাকে এতটা উতলা করে, খুবই মজা দেখ্ছিলে—না? আমি মনে কচ্ছিলুম আজ লোক পাঠিয়ে তোমার খবর নিব। নানা দুশ্চিন্তায় মনে এতটুকুনও শান্তি পাচ্ছিলুম না।"

মতিয়ার করস্পর্শে, হোসেনের প্রাণের ভিতর, একটা অফুরন্ত সুখের আবেগ ছড়াইয়া দিল। তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যেন কোন্ নিভৃত কন্দর হইতে জাগিয়া উঠিয়া, দিগ্বিদিকে পুলকের-বান ডাকাইয়া দিল। হোসেন মতিয়ার এতগুলি প্রশ্নের, কোন্টির উত্তর সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে ইতস্ততঃ করিয়া—সহাস্য বদনে বলিল "দু'টা দিন না আস্লে, তুমি যে এতটা ব্যস্ত হ'বে, তা'ত বুঝে উঠ্তে পারি-নি।"

মতিয়া তাহার বিলোল চক্ষু মেলিয়া হোসেনের মুখের উপর ন্যস্ত করিল, শেষে তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক, বেদির একপার্শ্বে বসাইয়া, আগ্রহ আকুলকণ্ঠে বলিল "তা তুমি বুঝ্তে পারলে কি আর এম্নি করে গা-ঢাকা দিয়ে থাক্তে? পুরুষ মানুষ বড়ই নিষ্ঠুর, এম্নি করে তা'রা আমাদের উতলা ক'রে,—আনন্দ অনুভব ক'রে থাকে! ভেবে দেখ দিকিন, অন্তরের ভিতর কত বড় দুশ্চিন্তা অনাহূত আত্মপ্রকাশ করে, বিছার ন্যায় হুল ফুটাতে থাকে? আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি—এখন হতে তুমি রোজ দু'বেলা আস্বে, দু'বেলাই যেন তোমায় দেখা পাই। আমার পক্ষে যদি তোমাদের

বাড়ী যাওয়াটা সুশোভন দেখা'ত, তবে দেখ্‌তে, যতটুকুন সম্ভব, আমি তোমার কাছ ছাড়া হতুম না। বল—আস্‌বে? তিন সত্যি কর!" বলিয়া মতিয়া হোসেনের স্কন্ধে হস্তদ্বয় সংন্যস্ত করিয়া, প্রত্যুত্তরের আশায় অপলক-নেত্রে তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

হোসেন ঈষৎ হাসিয়া, মতিয়ার গণ্ডযুগলে, অঙ্গুলদ্বারা এক টোকা মারিয়া বলিল "এত ব্যস্তই হও তুমি আমার জন্য? তা—ভেবে দেখ, বিচ্ছেদের অনুভূতির ভিতরই-ত মিলনের মোহন-স্পর্শের মধুরতা উপভোগ করা যায়,—বিরহ আছে বলেই-ত মিলনকে এত মধুরতম বলে চিনা যায়। এর মধ্যেই যে তুমি এত দরদী হয়ে গেলে, তা এখন্‌ও-ত বিয়ে—।"

কথায় বাধা প্রদান করিয়া মতিয়া বলিল "তা বটেই-ত,—বিয়ে,—? বল্‌তে গেলে—তা হয়-নি, তবে তা হ'তেই হবে,—দু'দিন আগ-পাছ, এই—ত? তুমি যে আমারি হয়ে আছ।"

হোসেন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মতিয়ার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল,—কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না।

মতিয়া হোসেনের মস্তক বুকে টানিয়া, ঈষৎ নিম্নস্বরে বলিল "কি ভাব্‌ছ বল দিকিন? বল্‌বে না আমাকে? ইস্‌,—আমার নিকট গোপন করবে? তা কিন্তু করো না,—তা হলে আমি বড্ড মনঃকষ্ট পাব, বুঝ্‌লে? বল কি ভাব্‌ছ,—লক্ষীটি আমার। আমার কাছে তোমার গোপন কর্‌বার-ত কিছুই নেই!"

হোসেন মতিয়ার ব্যগ্রতা ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপলক-নেত্রে [illegible] প্রতি তাকাইয়া, বলিল—"ভাব্‌ছিলুম,—আমাদের এত মাখামাখির পরিণাম কোথায়—কে জানে!"

দশম পরিচ্ছেদ

মতিয়া একগাল হাসিয়া বলিল "এই কথা,—তা পরিণামে,—পরিণয়ই লিখা আছে,—বুঝলে? বাবা সেদিন মাকে বল্‌ছিলেন, এক মাসের মধ্যেই এই শুভকার্য্য শেষ করে ফেল্‌বেন,—দেখ বল্‌ছি,—তুমি অশুভ চিন্তা করো না,—আমার-ত সেরূপ কোন চিন্তা কত্তেই মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠে।"

হোসেন প্রীতি-বিহ্বলনেত্রে চারিদিক অবলোকন করিয়া বলিল, "মতিয়া! সংসার এক ভয়ানক স্থান,—কিসে কি হয়, তা কেউ কি ঠিক করে উঠ্‌তে পারে? আজ যা বর্ত্তমান রয়েছে, দু'দিন পরে হয়-ত, তা মানবচিত্তের স্মৃতিপটে লিখিত, পুরাতন চিত্রে প্রকটিত হ'বে। এ শুধু আজ নয়, চিরকাল ধরে এবং চিরন্তর যুগান্তর ধরেই এই খেলা চল্‌ছে; বর্ত্তমান—চির বর্ত্তমান থাকে না,—পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই, জগতের অসীম স্রোত ছুটে চলেছে,—বিস্মৃতির কোলেই যেন তা'র চির-সুপ্তি! আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে। যদি অকপটে উত্তর দাও, তবে খুবই সুখী হব,—বল,—উত্তর দিবে?"

মতিয়া অভিমানের ভাণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। শেষে কয়েক মিনিট পরে, বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে ম্লান হাস্য সচেষ্টায় ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল "তোমার নিকট মনের কথা কোন দিনই-ত গোপন করি-নি,—জীবনে বোধ হয় তেমন অবস্থা আমার হবেই না। বল—কি জিজ্ঞাসা কত্তে চাচ্ছিলে?"

হোসেন ঈষৎ অপ্রতিভভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মতিয়া! মনে কর,—কোন কারণে, আমাদের এই মিলনের ভিতর যদি একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক এসে দাঁড়ায়,—তোমাকে কাজী

সাহেব যদি আমা অপেক্ষা কোন সুযোগ্য পাত্রে অর্পণ কত্তে চান, তবে তুমি সে অবস্থায় কি কর্‌বে ?"

মতিয়া চিন্তাক্লিষ্ট-নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত হোসেনের প্রতি তাকাইয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল। তাহার মুখ অকস্মাৎ ফেকাসে হইয়া গেল। মতিয়া কয়েক মিনিট সেই অবস্থায় থাকিয়া, হোসেনের প্রতি তাকাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল "তা হ'তেই পারে না,—বাবা সেদিন বলেছেন, তোমার সাথেই আমার বিয়ে দিবেন, শত বাঁধাবিঘ্নও এর ব্যতিক্রম ঘটাতে পার্‌বে না। আর যদি ভগবান একান্তই সেরূপ অবস্থার মধ্যে এনে দাঁড় করান, তবে জেনো, মতিয়া আত্মরক্ষা কত্তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌বে। প্রয়োজন হলে, মৃত্যুকেও সে বরণ কত্তে দ্বিধা কর্‌বে না। মৃত্যুর পরও, আমার মনে হয়, আমার আত্মা,—স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে, সেখানেও তোমার জন্য অপেক্ষা কত্তে চাইবে। তুমি আমারই হ'বে—এই তিন সত্যি করে বল্‌ছি। তুমি অপরের হ'বে, এ-ত আমি সহ্য কত্তে পারব না।"

হোসেন মতিয়ার উক্তিতে একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। তাহার শরীরের শিরায়, উপশিরায় এক অজ্ঞাত-আনন্দের-পুলক-প্রবাহ ছুটাছুটি করিয়া, তাহাকে সুখ-প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। হোসেন মতিয়ার মুখের উপর দৃষ্টি ঘুরাইয়া অপলক-নয়নে তাকাইয়া রহিল। বাক্যস্ফুরণের শক্তি যেন তাহার একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

মতিয়া হোসেনের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করিয়া, তাহার চিন্তাস্রোতকে বিভিন্নমুখী করাইবার উদ্দেশ্যে বলিল "প্রিয়তম! একটা গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা কত্তে ভুলে গেছি। আমিনা দিদিকে কেন আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে ? এখন তোমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে,—না ? পুরুষ মানুষের পক্ষে ঘরকন্না করা যে কত বড় ঝঞ্ঝাটে ব্যাপার,

তা আমার বেশ জানা আছে। আমার ইচ্ছা হয়, আমি গিয়ে তোমাদের সমস্ত পরিশ্রম লাঘব করে দি। জানি না, খোদা আমাকে সেই পরিচর্য্যার ভার কতদিনে করায়ত্ত করিয়ে দিবেন।"

হোসেন ঈষৎ বিমনা হইয়া, মতিয়ার মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল "সে কথা বাবা বল্‌তে পারেন, আমিনা দিদি আমাকে খুবই ভালবাসেন, প্রাণপণে আমাদের পরিচর্য্যা করেছেন। অনেক দিন সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় থেকে, পাখার বাতাস করে, আমাদের ঘুমাবার সাহায্য করেছেন, এতটুকুন অস্বস্তির কারণ হলে, তিনি একেবারে পাগলের ন্যায় ছুটে এসে, তার প্রতিবিধান করেছেন। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, আমাদের সংসারের শ্রী তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমিনা দিদিকে বিদায় করে, বাবাও যে বিশেষ শান্তি পাচ্ছেন, এরূপ মনে হয় না। তাঁ'র মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে গেছে, সময় সময় অকারণে, আমাকেও কটুক্তি কত্তে ছাড়েন না, আবার পর মুহূর্ত্তেই আমাকে বুকে টেনে নিয়ে, ছোট শিশুর মত কাঁদ্‌তে থাকেন, আমার মস্তকে হাত বুলিয়ে বলেন—বাবা! কিছু মনে করিস্‌নে, আমার মাথার ঠিক নেই। বাবার অবস্থা দেখে আমার খুবই চিন্তা হয়েছে।"

উক্তি শ্রবণ করিয়া মতিয়ার মুখ বিবর্ণতর হইয়া গেল। মতিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুগভীর পরিতাপের সকরুণ-স্বরে বলিল "তুমি সর্ব্বদা তাঁ'কে প্রফুল্ল রাখ্‌তে চেষ্টা করবে,—বুড়ো মানুষ, কত ঝঞ্ঝাট তাঁ'র মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, এই বিশ বছর তিনি কত কষ্ট করেই না এই সংসারটাকে সচল রেখেছেন। এদিকে, আমিনা দিদি এখানে এসেও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কারো সাথে বেশী কথা কয় না, কেমন গম্ভীরভাবে সমস্ত কাজকর্ম্ম করে যাচ্ছে। তা'র সেই সদা হাস্যমুখে, হাসির চিহ্নটি পর্য্যন্ত

নেই, এম্‌নি একটা বিষাদ ছায়া তা'র সমস্ত মুখে ছেয়ে রয়েছে। যাক্ সে কথা, সন্ধ্যা হয়ে এল, চল এখন বাড়ীর ভিতর যাই,—মা তোমাকে দু'দিন না দেখে, খুবই অস্বস্তি বোধ কচ্ছেন" বলিয়া মতিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শান্ত-শীতল সান্ধ্য-সমীরণ স্পর্শে, মতিয়ার, কাল আঙ্গুরের গুচ্ছের মত, চুলগুলি, সারা কপালে ছড়াইয়া পড়িল।

হোসেন মতিয়ার কপোলদেশে নিপতিত চুলগুলি সরাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল "তুমি এখন বাড়ীর ভিতরে যাও, আমি পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে নমাজ সেরে, এক্ষুণি আস্‌ছি।"

মতিয়া বলিল "চল পুকুর ঘাটে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব" বলিয়া মতিয়া হোসেনের অনুগমন করিল। হোসেন পুকুরের বাঁধা ঘাটে উপনীত হইয়া, নিম্ন সিঁড়িতে অবতরণ করিল এবং হাত মুখ প্রক্ষালনান্তর "নমাজে" আত্মনিয়োগ করিল। মতিয়াও বাঁধান ঘাটের সংলগ্ন, রাজপথের একধারে নীরবে দাঁড়াইয়া, হোসেনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঠিক এম্‌নি সময়ে, বাদসার একমাত্র পুত্র নছরতজঙ্, বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে, সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মতিয়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, সাহাজাদা মোহাবিষ্টের মতই একেবারে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এবং অপলক-দৃষ্টিতে মতিয়ার আপাদ-মস্তক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। মতিয়া আগন্তুকের অসীম চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া, পিছন ঘুরিয়া, ঘাটের সংলগ্ন প্রাচীর গাত্রে হেলান দিয়া দাঁড়াইল, সাহাজাদা নছরতজঙ্ কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ঔৎসুক্যাতিশয্যে মতিয়ার সম্মুখীন হইয়া, সংযত স্বরে বলিল "আপনার নামখানা কি, অনুগ্রহ করে বল্লে কৃতার্থ হব।"

মতিয়া তাহার বড় ভাসাভাসা চক্ষের দৃষ্টি, আগন্তুকের মুখের উপর বুলাইয়া, সহসা মস্তক নত করিল এবং ধীর কণ্ঠে বলিল "মতিয়া"।

সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া, কোমল কণ্ঠে বলিল "আমার নাম নছরতজঙ্—তোমার পিতার নাম জান্‌তে পার্‌লে বিশেষ সুখী হব।"

মতিয়া লজ্জা-রক্তিম-মুখে, লাজ-অলস-আঁখি মেলিয়া, কম্পিত স্বরে বলিল "বৈরম আলী কাজী" বলিয়াই মতিয়া, গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে, মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে স্থান পরিত্যাগ করিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গৃহ-প্রাঙ্গণে যাইয়া উপস্থিত হইল।

সাহাজাদা, মতিয়ার গমনকালীন, অপরূপ ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করিয়া, চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে মতিয়া দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইলে,—একটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, বন্ধুবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "এরূপ পরীর মত কন্যা আমাদের রাজ্যে আছে, এ-ত ধারণা কত্তে পারি-নি।" অতঃপর সাহাজাদা,—কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্লথ-গতিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হোসেন আলী নমাজ শেষ করিয়া, ঘাটের সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইল। পর মুহূর্ত্তে, সিঁড়ির সম্মুখস্থ দরজাপথে অগ্রসর হইতেই, সাহাজাদা—নছরতজঙ্‌কে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। হোসেন

ত্বরিত পদে পিছনের দিকে সরিয়া আসিয়া, ঘাটের দেয়ালের এক কোণে নীরবে দাঁড়াইয়া মতিয়া ও সাহাজাদার কথোপকথন শ্রবণ করিল। সাহাজাদার, শেষ মন্তব্যের কথা কয়টী, যেন জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় তাহার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিল।

সাহাজাদা স্থানান্তরিত হইলে, হোসেন রাস্তায় বাহির হইয়া উৎসুক বিহ্বল-দৃষ্টিতে মতিয়ার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। মতিয়াকে তথায় দেখিতে না পাইয়া, হোসেন বিষাদ-ক্লিষ্ট-মুখে, প্রস্তর-মূর্ত্তির মত, সিঁড়ির দেয়াল গাত্রে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া,—সাহাজাদার প্রতি কথাগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর ক্রমে একটা বিরুদ্ধ চিন্তার ঝড় প্রবলবেগে বহিয়া যাইতে লাগিল। এই অপ্রীতিকর অনুধাবনার সহিত তাহার পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের একটা মলিন ছবি অঙ্কিত করিয়া, স্বীয় প্রকৃত-প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন রাখিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত অন্তর ব্যথিত, পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হইয়া—তাহার অসীম ধৈর্য্যের বাঁধ ছিন্ন করিয়া দিল।

হোসেন ভাবিতে লাগিল,—এ ব্যাপার এখানেই শেষ হয়ে গেল, এমন মনে হচ্ছে না,—কথার ভাবে মনে হয়, মতিয়াকে দেখে সাহাজাদা অত্যধিক বিচলিত হয়েছেন। একটা মোহাবিষ্টের মত ভাব, তার অন্তরে হয়-ত সজাগ হয়ে, তাকে তন্ময় করে দিয়েছে। দেশের ভাবী উত্তরাধিকারী যদি মতিয়াকে পছন্দ করে বিবাহ কত্তে উদ্‌গ্রীব হন, তবে আমার মত দরিদ্রের পক্ষে, তা'র প্রতিকূলে দাঁড়ান খুবই বিপজ্জনক কাজ! বিশেষতঃ কাজী সাহেব বাদসার শ্বশুর হবার মত এত বড় প্রলোভন ত্যাগ করে, বালিকা মতিয়ার মত সমর্থন কর্‌বার সপক্ষে দাঁড়াতে কখনও চেষ্টা কর্‌বেন না। স্বয়ং বাদসা

একাদশ পরিচ্ছেদ

যদি মতিয়াকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কত্তে চান, কাজী সাহেব সে ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র বালিকার সামান্য আপত্তি কখনও গ্রাহ্য কত্তে চাইবে না। যদি-বা মতিয়ার মত সমর্থন কত্তে গিয়ে বাদসাকে ক্ষুণ্ণ করেন, তবে এ বিবাহে আমাদের শান্তি কোথায়? হায়! আজকার দিনের মত এত বড় দুর্দ্দিন হয়-ত,—আমার জীবনে আর কখনও আস্‌বে না। মতিয়াকে আমার সাথে ঘাটে আস্‌তে নিষেধ করেছিলুম, সে যদি আমার অনুরোধ উপেক্ষা না কত্ত, তবে হয়-ত এই আকস্মিক অশান্তির ভিত্তি গ্রথিত হতে পাত্ত না! মতিয়ারই-বা দোষ কি? এ হল গিয়ে, খোদার বিধান,—মানুষের এতে কোনই হাত নেই। মানুষকে তিনিই সময়োপযোগী পথে পরিচালনা করেন, মানুষ পরিণাম ফল সমালোচনা করে,·স্বীয় কর্ম্মকুশলতাকে হেয় বলে প্রতিপন্ন করিয়ে দেয়! এ ক্ষেত্রে এখন আমার কি কর্ত্তব্য?—কর্ত্তব্য? কিছুই নেই,—খোদার বিধান, মাথা পেতে লওয়া ছাড়া, আর দ্বিতীয় পথ নেই-ই। কিসে কি হয়, কেউ বল্‌তে পারে না,—হয়-ত এর পরিণাম মন্দ না হয়ে, ভালও হ'তে পারে! ভাল হ'বে?—না,—বড়লোক স্বীয় অস্বস্তি প্রশমিত কত্তে গিয়ে, ন্যায় অন্যায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না! স্বীয় ক্ষমতার অসীম প্রভাবে, যাহা লোভনীয়,—যাহার সম্ভোগে তৃপ্তি আনয়ন করে, তা' করায়ত্ত কত্তে প্রাণপাত করে থাকে,—এ-ত সামান্য বিষয়! মতিয়ার অমত হবে?—না—অমত নাও সে কত্তে পারে! বাদসার বেগম হবে,—ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করবে,—এত বড় প্রলোভন উপেক্ষা করে, ভালবাসার স্মৃতিটুকুন আঁক্‌ড়িয়ে ধরে, স্বইচ্ছায় মতিয়া দরিদ্রতা বরণ করে তৃপ্তি অনুভব করবে? এ-ও কখন হয়ে থাকে? মতিয়া যদি-বা অমত করে,—মস্ত প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে,—তবে কাজী সাহেবের উপায় কি হবে? কাজী সাহেব একান্তই যদি বাদসার প্রার্থনা উপেক্ষা

করে, মতিয়াকে আমার হাতে তুলে দেন, তার ফলে কাজী সাহেবকে হয়-ত জীবনরক্ষার জন্য দেশত্যাগী হ'তে হ'বে! তিনি জেনে শুনে এতটা কত্তে যাবেন? না—এ-ত হ'তে পারে না! হায়! খোদা! কোন্ অপরাধে,—এম্নি গোলক ধাঁধায় আমাকে টেনে নিয়ে এলে? যাক্—দেখি এর পরিসমাপ্তি কোথায়! অতঃপর হোসেন স্খলিত-চরণে, কাজী সাহেবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। আকস্মিক ভাবাতিশয্যের উত্তেজনায় তাহার বক্ষে, উত্তাল-শোণিত-স্রোত, উদ্দামভাবে নৃত্য করিতে লাগিল।

হালিমা বিবি ইতিপূর্ব্বে, মতিয়ার নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। তিনি হোসেনকে বাড়ীর অঙ্গণে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইতে দেখিয়া পরম যত্নে গৃহে লইয়া গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এক থালা মিষ্টি দ্রব্য হোসেনের সম্মুখে সংরক্ষণ করিয়া,—জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। হোসেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও জলযোগ শেষ করিয়া ফেলিল এবং সরলভাবে সাহাজাদার শেষ মন্তব্যের প্রতি অক্ষর, হালিমা বিবিকে শুনাইয়া দিল। হালিমা বিবি—নানা কথায় হোসেনকে অনেকটা আশ্বস্ত করিয়া, কাজী সাহেবের নিকট যাইয়া, সমস্ত বিবৃত করিলেন।

কাজী সাহেব সমস্ত শুনিলেন এবং একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন "এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছুই নেই, এর পরিণামে অশান্তি আনয়ন করা ছাড়া,—আর কিছু হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।"

এই ঘটনার পর, প্রতিবাসিগণ নানা কথার অবতারণা করিয়া, দাম্পত্য অশান্তির ইন্ধন জোগাইতে লাগিল, অনেকেই বলিতে লাগিল:—"মতিয়ার কপাল ভাল,—যা' তা' নয় একেবারে বেগম হবে,—একি কম তপস্যার

ফলে হয়ে থাকে? কাজী সাহেবের দিন ফিরে গেল,—বাদসার শ্বশুর হলেন, তিনিই-ত রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা হবেন,—একেই-ত বলে,—"দশ পুত্র সম কন্যা, যদি সুপাত্রে অর্পিত হয়!" কাজী সাহেব সমস্তই শুনিতেন—কোনই প্রত্যুত্তর করিতেন না।

আজ শনিবার। বেলা তিনটা বাজিতেই কাজী সাহেব বিচারকার্য্য শেষ করিয়া, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, ঠিক এম্‌নি সময়ে, বাদসার একান্ত অনুগত ভৃত্য—আমির খাঁ, কাজী সাহেবের সম্মুখীন হইয়া জানাইল "খোদ বাদসা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কচ্ছেন, তিনি খাস কামরায় আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।"

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া,—ধীর পদ-বিক্ষেপে আমির খাঁর অনুগমন করিলেন। কাজী সাহেব কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাদসার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে, শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাদসা—কাজী সাহেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, প্রত্যাভিবাদন করিলেন এবং আসন ত্যাগ করিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত, কাজী সাহেবের হস্ত ধারণপুর্ব্বক, একখানা বহু মূল্য কার্পেট-মণ্ডিত আসনে আনিয়া উপবেশন করাইলেন। নিজেও পার্শ্বের একখানা আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

কাজী সাহেব বিশেষ আগ্রহ সহকারে, বাদসার মুখের উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া, পরিবারস্থ সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাদসা সহাস্য বদনে কাজী সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "শারীরিক ভালই আছি আমরা,—তবে কোন বিষয় নিয়ে আমি মানসিক অশান্তি অনুভব কচ্ছি।"

কাজী সাহেব চিন্তা-ম্লান মুখে বলিলেন "খোদ বাদশার অস্বস্তির কারণ জানতে এ অধীনের খুবই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে।"

বাদসা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন "বিশেষ তেমন কিছু না হলেও,—ব্যাপার বড়ই জটিল। তাই আপনার সাথে একটা বিশেষ পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা এসে দাঁড়িয়েছে।"

কাজী সাহেব সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন; কিন্তু মনের চঞ্চলতা গোপন করিয়া—মৃদু অথচ মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন "বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করলেই,—অধীন জন বিশেষ কৃতার্থ হবে।"

বাদসা সামান্য ইতস্ততঃ করিয়া বিনম্রকণ্ঠে বলিলেন "আপনার সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করবার পরামর্শ নিয়েই, অসময়ে আপনাকে আহ্বান করেছি।"

কাজী সাহেব নিতান্ত সহজভাবে, অঞ্জলিবদ্ধ-করে উত্তর করিলেন "ঘনিষ্ট সম্বন্ধ! খোদ বাদসার সাথে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ?—এ'টা যেন প্রহেলিকা বলেই মনে হচ্ছে। আমি আপনার চাকর,—দরিদ্র প্রজা, এ অনুষ্ঠানের শেষটা,—শুভ-ফলপ্রদ হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

বাদসা—দৃঢ়স্বরে বলিলেন "অশুভর কোনই আশঙ্কা নেই এর ভিতর—কাজী সাহেব! কথাটা হচ্ছে,—নছরতজঙ্, ক'দিন হল, বেড়াতে গিয়ে, আপনার কন্যা মতিয়াকে দেখে এসেছে। তা'র ইচ্ছে মতিয়াকে গ্রহণ করে, সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে। তা'র জননী—তা'কে অনেক বুঝিয়েও এ-মত—পরিবর্ত্তন করাতে পারে-নি। সে জানিয়েছে মতিয়া ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। একমাত্র পুত্র,—রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী—তার জীবন যা'তে মরুভূমিতে পরিণত না হয়, তা'ত দেখা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ক'দিন আমি আর বেঁচে থাকব! এর পর এ-পুত্রই-ত বাদসা হয়ে, রাজ্য শাসন করবে। আমি

আপনাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখি, এ সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে, আমার অবর্ত্তমানে, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ লোককে পরামর্শদাতারূপে লাভ করে,—বিশেষ কৃতিত্বের সাথে রাজ্য পরিচালনা কত্তে পার্‌বে।"

কাজী সাহেব অতিকষ্টে সহিষ্ণুতা রক্ষা করিয়া, সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"এ প্রস্তাব উত্থাপন করে, বাস্তবিকই আপনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। বাদসাকে জামাতারূপে লাভ করা,—ক'জনার ভাগ্যে ঘটে থাকে? তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় বল্‌তে হবে,—এ সম্মান লাভ করা, আমার ভাগ্যে ঘটে উঠ্‌বে না। মতিয়া বাগ্‌দত্তা,—বিয়ে না হয়ে থাক্‌লেও, এক রকম সমস্ত ঠিক হয়েই রয়েছে। তবে পরামর্শ দাতার কথা বল্‌ছেন,—এ চাকর চিরদিনই সাহাজাদার সাহার্য্য কত্তে—প্রস্তুত থাক্‌বে।"

বাদসা আগ্রহান্বিতস্বরে বলিলেন "কে সেই নির্ব্বাচিত পাত্র?"

কাজী সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন "বৈরম আলীর পুত্র,—হোসেন আলী। অতি শৈশব হ'তেই এরা দু'জন খেলাধূলা কত্ত,—ক্রমে এক সঙ্গে থেকে এতখানি বড় হয়েছে, দু'জনার খুবই মিল,—এ বিবাহে প্রতিবন্ধক দাঁড় করালে—মতিয়ার সুখের আশা একেবারেই নেই,—তাই আমি বাধ্য হয়ে অমত কত্তে চাচ্ছি,—তজ্জন্য ক্ষমা কর্‌বেন।"

বাদসা সাহেব মাথা নাড়িয়া স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন "বটে। তা ছেলের মত পরিবর্ত্তন করাতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি,—কোন ফল হ'বে না দেখ্‌ছি। মতিয়াকে সে বিয়ে কর্‌বে—এই তা'র দৃঢ় সঙ্কল্প।"

প্রত্যুত্তরে কাজী সাহেব তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী দৌলতন্নেছার সাথে, সাহাজাদার বিয়ের সমস্তই না ঠিক হয়ে রয়েছে! সে—সুশ্রী, গুণবতী, সেই-ত বেগম হ'বার সম্পূর্ণ উপযুক্তা।

বিশেষতঃ খোদ বাদসা তা'কে বিশেষ স্নেহ করেন,—স্বীয় কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করে আস্‌ছেন, তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, অন্য কাউকে বেগমের স্থানে বসালে, সেই নিরীহ তরুণীর উপায় কি হবে তাহাও-ত চিন্তা কত্তে হ'বে।"

বাদসা একটুকুন বিরক্তির স্বরে বলিলেন "সেটা অনেকবার চিন্তা করেছি। ছেলে যখন মতিয়াকে বিয়ে কত্তে চাইছে, এ অবস্থায় দৌলতন্নেছাও বেগমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক্‌বে,—এ-ত বাদসার পক্ষে নূতন কিছু নয়! বয়ঃসন্ধির কাল হ'তে, পুরুষের প্রেম—সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জ,—এবং নারীর দেহের সৌন্দর্য্যই তাকে মুগ্ধ করে।"

কাজী সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন "নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ধন হলেও, পুরুষের হৃদয়হীনতার সাহচর্য্যে, নারী কোন দিনই তৃপ্তি ও শান্তিলাভ কত্তে পারে না। বাদসার অসীম শক্তি, বাসি ফুলের ন্যায় পরিত্যক্তা নারী, উপায়ান্তর নেই বলেই-ত, সমস্ত সহ্য কত্তে বাধ্য হয়।"

বাদসা তেজব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "তবে কি আপনি বল্‌তে চান,—মতিয়ার মতামতের উপর বাদসাকে নির্ভর করে থাক্‌তে হবে?"

বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া কাজী সাহেব একেবারে অগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন "তা ঠিক বল্‌তে চাই না। তবে মতিয়া অন্য কাউকে বিয়ে কর্‌বে না,—এও তার পণ।"

বাদসা অবরুদ্ধ ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া, শ্লেষ-প্রচ্ছাদিত-কণ্ঠে বলিলেন "আমার পুত্রও মতিয়াকে বিয়ে কর্‌বে,—এও তার পণ। এর উপর আপনার আর কি বক্তব্য থাক্‌তে পারে?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া, কাজী সাহেবের সর্ব্ব শরীর যেন বিতৃষ্ণায় শিহরিয়া উঠিল। তিনি কয়েক মিনিট নীরবে বসিয়া থাকিয়া, তেজ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "শুধু কয়েক মিনিটের চোখের দেখার মোহের উপর এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সমাধা হতে পারে না। দৌলতন্নেছাকে বিবাহ কত্তে এতদিন বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শুনেছি তাকে নাকি সাহাজাদা বাস্তবিকই ভালবাসতেন,—হঠাৎ মতিয়াকে দেখে তাঁ'র মত পরিবর্ত্তন হয়ে গেল, এতদিনের আন্তরিকতা, কোন্ অতল-তলে ভাসিয়ে গেল, এর ভিতর, ভালবাসার মোহ বলে-ত কিছু নেই, একটা রূপজ মোহকে টেনে নিয়ে, তিনি পুতুল-খেলার উপকরণ সংগ্রহ কত্তে চাচ্ছেন! কে জানে,—মতিয়ার পাণিগ্রহণ করার পর,—আবার কাউকে দেখে, তাঁ'র মতের পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে না? জেনে শুনে,—মতিয়াকে এম্‌নি অশান্তিমূলক ব্যাপারে টেনে নিতে, মনে চাইছে না। দৌলতন্নেছার ন্যায়, মতিয়াও প্রত্যাখ্যিত হলে, আমার পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় হয়ে দাঁড়াবে!"

বাদসা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "এটা কেবল মাত্র বাদসার পক্ষেই সমভাবে খাটে;—বাদসার তৃপ্তির জন্য, সমস্ত রাজ্য তাঁ'র করায়ত্ত, তবে বিনা আপত্তিতে, মতিয়াকে বিবাহ করে নেওয়ালে, সে-ত আপনারই গৌরব বৃদ্ধি করবে। এ বিবাহে মতিয়ার মান শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত হ'বে, বিনা আপত্তিতে এ বিবাহ সুসম্পন্ন হ'তে দেওয়াটা, আপনার পক্ষে খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।"

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া, ভারী গলায় থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন "বাদসা সাহেব! বিবাহ জিনিষটা পুতুল-খেলা বলে ধরে নেওয়া চলে না,—বিবাহে প্রাণ বিনিময়ের সুবর্ণ-সোপান নির্ম্মাণ করে, মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও ভাবুকতাদ্বারা সংশোধিত

ও পরিমার্জ্জিত, দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার—শান্ত, সংযত রূপই হল প্রেম। যে প্রেম মানুষের ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে প্রেমই হচ্ছে সার্থক ও সুন্দর! মানব হৃদয়ের যা' কিছু মহৎ, যা' কিছু উদার, যা' কিছু সুন্দর, তা'কেই এই প্রেম সঞ্জীবিত করে! অপর পক্ষে, উহা ভাবুকতাহীন, কুশ্রী ও ভীষণ,—কেবলমাত্র পাশবিক লালসা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। রূপজ মোহের আকর্ষণে যে প্রেমের সমুদ্ভব,—তা কেবল ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থের ভিতরই পরিসমাপ্তি লাভ ক'রে থাকে! সে আনন্দ শরতের রৌদ্রের মত বড়ই ক্ষণিক, অন্তরের ভিতর স্থায়ী সুখ এনে দিতে পারে না। নারী মাত্রেরই মনের কোণে, একটা বিবাহ-ক্ষুধা জেগে উঠে, সে অবস্থায় যদি কোন পুরুষ অন্তরের মহিমায় তা'কে মুগ্ধ কত্তে পারে, সে তা'কেই সম্পূর্ণ হৃদয় দান করে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিট্‌লেই নারীর সকল প্রয়োজন মেটে না। পুরুষের ইন্দ্রিয়-শক্তি ও অন্তঃসার-বিহীন বাহ্য-সৌন্দর্য্য, নারীর হৃদয়কে কোন দিনই মুগ্ধ কত্তে পারে না, পুরুষের অন্তরের মহত্ত্বের দিকেই নারীর লক্ষ্য ঢের বেশী! এ অবস্থায় বিবেচনা করে দেখুন,—হোসেন ও মতিয়ার মিলন কতটা বাঞ্ছনীয়। বাদসা ধনকুবের, শক্তিশালী বলে সেদিক দিয়ে তাঁ'র পরিতৃপ্তি হতে পারে,—কিন্তু প্রণয়-রাজ্যের অফুরন্ত শান্তি ভোগের স্বাদ, তাঁ'দের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে উঠে না। শত শত পরিবর্ত্তনের ভিতর, তাঁ'দের লালসাই বেড়ে চলে—তৃপ্তির সন্ধান তাঁ'রা কোন দিনই পান না।"

বাদসা—কাজী সাহেবের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অভিব্যক্তিতে চমকিয়া উঠিলেন। কয়েক মিনিট নীরবে বসিয়া থাকিয়া ঈষৎ আরক্ত মুখে, ভ্রূকুটি-বদ্ধ নেত্রে বলিলেন "এ বিবাহে মতিয়ার যে তৃপ্তি হবে না, এরূপ চিন্তা, আবর্জ্জনা বলেই মনে হয়। মতিয়া যদি স্বীয় গুণে ও ক্ষমতায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কত্তে পারে, তবে অসীম প্রভুত্ব পরিচালনের ক্ষমতা আপনা হ'তেই করায়ত্ত

করে নিতে পার্‌বে! এ বিষয়ে আর প্রতিবাদ করে কোনই ফল হবে না। মতিয়াকে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ কর্‌ব, এই আমার দৃঢ় পণ,—আপনাকেও এ বিষয়ে মত দিতে হবে, এ-ও আমার একান্ত অনুরোধ।"

কাজী সাহেব উন্মাদনাময় স্বরে, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "খোদাবন্দ! মানুষ যে কা'র দাস তা' ঠিক জানা যায়-নি, তবে তা'রা যে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ের দাস, এটা ভাল করেই প্রমাণিত হয়েছে! আমি সব দিক দেখে বল্‌ছি, এ বিবাহ হ'তে পার্‌বে না, আপনি দৌলতন্নেছার সাথে সাহাজাদার বিয়ে দিয়ে, ন্যায়-বিচার করুন। আপনি চিরদিন আইনের ব্যবস্থা প্রতিপালনের পক্ষপাতী, আপনার নিজের গড়া আইনের আজ্ঞা অবমানিত করে, কলঙ্ক কিনে নিতে চাইবেন না!"

বাদসা শ্লেষকণ্ঠে ঝাঁঝের সহিত বলিলেন "আইন অমান্য—? তা' হতে দোব না। সর্ব্বসমক্ষে মতিয়াকে বিবাহে মত করাবই, তা'র পর বিয়ে দোব! এর ব্যতিক্রম কোন দিনই ঘট্‌তে দোব না।"

কাজী সাহেব দৃঢ়, অথচ চিরসংযত স্বরে বলিলেন "বাদসা সাহেব! যে সূর্য্য-রশ্মি ইচ্ছা কর্‌লে পৃথিবী ভস্ম কত্তে সক্ষম হন, তা' না করে, সূর্য্য যে তাঁর তেজ, মানবের হিতের জন্য নিয়োজিত করেন, সেখানে কি তাঁ'র মহত্ত্ব পরিস্ফুট হয় না? তাঁ'র সংহার-শক্তিকে কারণান্তরের জন্য সংহরণ করেন বলে কি, তাঁ'র শক্তির অভাব ঘটেছে বুঝা যায়? রুদ্রের ভিতর ধ্বংসের শক্তি আছে বলেই কি, ক্রীড়নক করে তুলে থাকেন? আপনি দেশের মালিক, শক্তিতে সকলকে পরাস্ত কত্তে পারেন; কিন্তু ন্যায়ের সূক্ষ্ম মাপের কাছে, আপনাকে মাথা নোয়াতেই হ'বে। খোদার বিধানের কাছে,—আপনার শক্তিকে খর্ব্ব হ'তেই হ'বে। মতিয়া আপনার পুত্রবধূ হবে না,—কোন দিনই হ'তে পারে না, এটা আপনি জেনে রাখ্‌বেন।" কাজী সাহেব তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের শেষ কথা শুনাইয়া দিয়া,—

বাদসাকে কোন প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়াই যথোচিত অভিবাদনপূর্ব্বক, গত্রোত্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কাজী সাহেব, বাদসার খাস কামরা হইতে বাহির হইয়া একেবারে বৈরম আলীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাদসার উক্তির সার মর্ম্মগুলি তাহাকে সংক্ষেপে অবগত করাইয়া, স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিলেন। বৈরম আলী একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাদসার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বিবাহের সপক্ষে কোন কিছু করাটা যে বিপদ-সঙ্কুল, তাহা জানাইয়া দিল এবং উদাস-দৃষ্টি মেলিয়া একটা জড়পিণ্ডের মতই, ভূমি নিবদ্ধ নেত্রে নীরবে বসিয়া রহিল।

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া তীব্রকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "প্রতিদ্বন্দ্বী হব বৈ-কি! এম্‌নি করে যথেচ্ছাচারীর কার্য্যের ইন্ধন জ্বালাবার সহায়তা কর্‌লে—কারো সুখ শান্তির আশা একেবারেই থাক্‌বে না। বাধা পেলে, অন্ততঃ পক্ষে,—কিছু সুফলও ফল্‌তে পারে। আমি জানি হোসেনের সাথে মতিয়ার বিয়ে না হলে, এদের জীবন রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আর বিশেষতঃ আমি আপনাকে—ভাল করেই বলে দিচ্ছি,—বাদসা মতিয়াকে পুত্রবধূ করে নেবার জন্ম যতই চেষ্টা করেন না কেন, এর ভিতর, একটা মস্ত প্রতিবন্ধক,—বিধাতার বিধিলিপির মতই, আত্ম-প্রকাশ কচ্চে চাচ্ছে;

যাঁ'র নিকট বাদসাকে মস্তক অবনত কত্তেই হবে। এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না চাওয়া,—আর এদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া,—একই কথা বলে মনে হয়। বাদসার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আশু অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে, শেষটায় আমারই জয় হবে,—এটা খুবই সত্য বলে মনে হয়। আমি তিন দিনের ভিতর এই বিবাহ কার্য্য শেষ করে ফেল্‌ব মনে করেছি। আমি এক রকম প্রস্তুত হয়েই আছি। আপনি নিতান্ত—নির্লিপ্তভাবে থাকুন, যা' কিছু কত্তে হয় আমিই কর্‌ব। কাল প্রাতে আমিনা এসে, আপনার এ দিককার সমস্ত ঠিকঠাক করে যাবে। টাকা পয়সায় যা প্রয়োজন হতে পারে, তা' আমি তার সাথে পাঠিয়ে দোব। আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কর্‌বই,--দেখে নিবেন।"

বৈরম আলী, কাজী সাহেবের দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিব্যক্তির প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না। সে জানিত কাজী সাহেব যাহা করিতে মনস্থ করেন, তার পরিবর্ত্তন ঘটান, বড় একটা সহজ সাধ্য বলে কোন দিনই ঘটে উঠে না। বাদসা নানা অশান্তির সৃষ্টি কত্তে পারে,—তা কাজী সাহেব জেনে শুনেও যখন,—এ কাজে মাথা পাত্‌তে এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ কচ্ছেন না, তখন পুত্রের মঙ্গলের জন্য আমিও কাজী সাহেবের সহায় হব,—এ—না হলে অকৃতজ্ঞের পরিচয়ই দিতে হবে। বিশেষতঃ—এ বিবাহ ভেঙ্গে দিলে, শান্তির-ত আর কোন আশাই থাক্‌বে না, এর চেয়ে গুরুতর অশান্তি যে আর কি হতে পারে তাও-ত বুঝে উঠ্‌তে পারি না! শেষে বৈরম আলী প্রকাশ্যে বলিল "আপনি যা ভাল মনে করেন তা-ই কত্তে পারেন,—আমি এর বিপক্ষে দাঁড়াবার কোনই চেষ্টা করব না। হোসেনকেই নিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কচ্ছি,—তাকে অসুখী করে, আমার পক্ষে 'বাঁচা-মরা দুই-ই

সমান মনে হচ্ছে। খোদার ইচ্ছায় সবই হয়ে থাকে,—এও হয়-ত তাঁরই পরীক্ষা,—দেখা যাক্, কি দাঁড়ায়!"

কাজী সাহেব নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যায় প্রাক্কালে, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন ভোর সাতটায়—আমিনা বৈরম আলীর গৃহে আগমন করিয়া, নিতান্ত আপন সংসারের মতই, সাংসারিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। আমিনা অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, একদিনের মধ্যেই বাড়ী ঘরের সংস্কার করিয়া, নূতন শ্রী ফিরাইয়া আনিল। আমিনা বিবাহের আবশ্যকীয় সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, সমস্ত গুছাইয়া রাখিল।

বৈরম আলী নীরবে বসিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং আপন মনে গান গাহিয়া, সুরের মঞ্জুল তানের ভিতর আপনাকে মসগুল করিয়া রাখিত। আমিনা সেই সুরের মূর্চ্ছনায় একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইত এবং নিতান্ত উন্মনার মতই ভাবিত, সুরের পঞ্চম তানের ভিতর কি মাদকতা আছে কে জানে, তা শুন্‌লে মানুষ কেন এত আকুল হয়? বিগত জীবনের স্মৃতি কেন কুহক-মন্ত্রে জেগে উঠে, ধৈর্য্যের বাঁধ সব ছিঁড়ে দিতে ব্যস্ত হয়? যাঁকে পাওয়া যাবে না, তাঁ'র কথা নিয়ে, তাঁ'র সৌন্দর্য্যের ছবি নিয়ে, সারা চিত্ত কেন এম্‌নি ভাবে মথিত হ'তে চায়? আমার ব্যথিত হতাশ অন্তরের সমুত্থিত, আকুল-ক্রন্দন আমাকে কেন এম্‌নি করে বিকল করে ফেলে? আমার-ত আপনাকে তাঁর নিকট প্রকাশ কর্‌বার অধিকার নাই, জীবনের শত বাধা বন্ধন ছিন্ন কত্তে চাইলেও আমাদের দুইয়ের ভিতরকার ব্যবধান সরে যেতে চায় না কেন? আমার প্রাণ-ভরা আহ্বান, আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁ'র অন্তর টেনে আন্‌তে না পারে, তবে

মিথ্যা এ সংসার, মিথ্যা আমার প্রেম, মিথ্যা এইরূপ কৌমুদী! সে যদি তাঁ'র মনের শান্তি অব্যাহত রাখ্‌তে পারে, তবে আমার অন্তরটা কেন এম্‌নি ভাবে উৎকণ্ঠা নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরে; এম্‌নি করেই পোড়াবার জন্যই কি খোদা আমাকে জগতে সৃষ্টি করেছেন।

এম্‌নি নানা ভাব-তরঙ্গের উঠা-নামার ভিতর দিয়া আমিনা দুইটা দিন কাটাইয়া দিল। বেলা চারিটা বাজিয়াছে, আমিনা বৈরম আলীর এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে ধীরকণ্ঠে বলিল "ওস্তাদজি! বিবাহ উপলক্ষে যা' যা' করার প্রয়োজন, প্রায় সবই ঠিক্‌ঠাক্ করে ফেলেছি, কাল বিয়ে, এখন আমি ফিরে যেতে চাই।"

বৈরম আলী মন্ত্র-মুগ্ধের মতই কথা কয়টি শ্রবণ করিল—শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমিনা! তুমি আমার জন্য যা' কচ্ছ, তা'র তুলনা হয় না, এর প্রতিদান দেবার মত আমার-ত কিছুই নেই।"

আমিনা বৈরম আলীর মুখের উপর একটা তীব্রদৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিল, প্রতিদানের কিছু নেই? সবই-ত তোমার নিকটে রয়েছে, তোমার সামান্য এতটুকুন দানেরই যে আমি কাঙ্গাল, তবে কেমন করে বুঝাব, তোমার নিকট আমি কি চাই! মুখে বলিল "ওস্তাদজি! প্রতিদান! সে কথা যাক্,—প্রতিদানের আশা নিয়েই যদি সব কাজ করা যায়, সব কাজে আপনাকে নিয়োগ করা যায়, সুফল তা'র ভাগ্যে ঘটে উঠে না! এ বাড়ীতে কাজ কত্তে কে যেন আমার শরীরে অসীম-শক্তির প্রস্রবণ বহায়ে দেয়, তোমার কাজে ডুবে থাক্‌তে একটা শান্তি-সুধা কে যেন আমার বুকে জড়িয়ে দেয়,—আমি প্রতিদানের কথা ভেবে-ত কিছু করি না। তোমার পরিচর্য্যা করে আমার তৃপ্তি, কিন্তু তুমি-ত সে অধিকার হ'তে আমাকে বঞ্চিত করেছ, এ-ত আমি সহ্য কত্তে পাচ্ছি না! এ দুদিন

এত পরিশ্রম করেও-ত আমি ক্লান্ত হই-নি। তোমার যা'তে তৃপ্তি আনে, তা'তেও যে আমার শান্তি; তুমি যা'তে সুখী হও তা'র জন্য আমি সব-ই কত্তে পারি। এ'টা তুমি বেশ করে জেনো, তোমার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, আমি এতটুকুন তৃপ্তি লাভের চেষ্টা—কোন দিনই কর্‌ব না।"

বৈরম আলী ভূতাবিষ্টের মত কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া থাকিয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল এবং আমিনার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্তে তুলিয়া লইয়া, জড়িতকণ্ঠে বলিল "আমিনা! তোমাকে বিদায় করে দেবার কারণ, তোমার প্রতি হতাদর প্রদর্শন করা, এ'টা যদি মনে করে থাক তবে, তুমি খুবই ভুল বুঝেছ। আমাকে সকলেই সংযমী বলে শ্রদ্ধা করে, আমি যদি এ অবস্থায় মত পরিবর্ত্তন করে বসি, লোকে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে! এ ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায় এর ভিতর ছিল না; কিন্তু এই ক'মাস আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তা'ত কারো নিকট প্রকাশ কর্‌বার সুবিধা পাই-নি। এতদিন আমি বহুরূপী সেজে, নিতান্ত নির্লিপ্তের ভাবই বাহিরের লোকের নিকট প্রকাশ করেছি। তোমার উপর আমার একটা অধিকার আছে কি না বিবেচনা করেও, তোমার উপর একটা দাবী-দাওয়ার আশা পোষণ করে অনেকটা তৃপ্তি অনুভব করেছি। হোসেন আমার জীবনের সম্বল, তা'র কোন অমঙ্গল হতে পারে এমন কাজে হাত দিতে আমার একেবারেই ইচ্ছে হয় না, আমি এখন দেখ্‌ছি, তোমাকে আপন করে নেবার মত, এত বড় লাভ, আমার আর কিছুতেই হতে পারে না। এই কয় মাসের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝেছি—ভালবাসা জিনিষটাকে আড়াল করে, সেটাকে একেবারে উপেক্ষা করে, জীবনের গতি নির্দ্দেশ করার সামর্থ্য মানুষের নেই। এত বড় শক্তির

স্ফূরণ উপেক্ষা করে, যা'রা লোক-দেখান সংযমতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের জীবনে শান্তির আশা-ত নেই-ই, অধিকন্তু অপ্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানের অবতারণা করে, পদে পদে অপদস্থই হয়ে থাকে। আমি খোদা সাক্ষী করে বল্‌ছি, তুমি আমারই হবে, তোমাকে না পাওয়ার মত এত বড় ক্ষতির আঘাত সহ্য করার শক্তি আমার একেবারেই নেই।"

আমিনা তীব্রকণ্ঠে বলিল "ওস্তাদজি! সে হবার আর উপায় নেই! যে দিন জানতে পেরেছি, আমাকে পাওয়ার ভিতর তোমার পক্ষে লোকনিন্দার আশঙ্কা রয়েছে, তোমার এত বড় সঙ্কল্প-ভ্রষ্টের সঙ্গে সঙ্গে, লোকের চক্ষে হাস্যাস্পদ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে, কার্য্যে হস্তক্ষেপণ কত্তে, একটা অসীম সঙ্কোচ তোমার অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌বে, সে দিন আমি সমস্ত আশা মন হইতে বিদায় দিয়েছি। আমি স্ত্রীলোক হলেও, আমার একটা সত্বা রয়েছে। স্বীয় স্বার্থ বলি দিয়ে, অপরের হিতে জীবন ক্ষয় কর্‌বার শক্তি রয়েছে, একটা অসীম সংযমের ভিতর জীবন টেনে নিয়ে, নির্লিপ্ততাকে বড় করে, সাধনা কর্‌বারও সামর্থ্য রয়েছে। মানুষের অন্তরে কত আকাঙ্ক্ষার প্রবাহই ছুটে চলে, সব আকাঙ্ক্ষা খোদা কাউকে পূরণ কত্তে দেন না। তা' বলে, কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হবার মত চাঞ্চল্যের প্রশ্রয় দিয়ে, আপনাকে অপদার্থ প্রতিপন্ন কর্‌বার ইচ্ছা নেই। হোসেন তোমার জীবন সম্বল, কাজেই আমারও সে পরম আদরের জিনিষ। লোক চক্ষে মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশ কর্‌বার অবকাশ না পেয়ে থাক্‌লেও, সেই স্নেহ-পীযূষ-ধারার বীজ শরীরের প্রতি শোণিত-স্রোতের তালে ছুটে চলেছে। সেই একমাত্র অসীম স্ফূরণ বুকে করে, আমিও হোসেনকে আপন করে নিয়েছি। হোসেনও আমার ছেলে, তার মঙ্গলের জন্য

প্রাণপাত করব, এই হচ্ছে আমার জীবনব্রত। এতে তোমাকে শান্তি এনে দিবে বলেই, ইহাই জীবনের একমাত্র কাম্য বলে ধরে নিয়েছি! তুমি লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ না হও, তা'র জন্য আমাকে যা' সহ্য কত্তে হয়, তাই করব, এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কত্তে ভগবান আমার সহায় হবেন, এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা!" বলিয়া আমিনা বৈরম আলীর হস্ত হইতে স্বীয় হস্ত টানিয়া লইল।

বৈরম আলী উন্মত্ত-অধীর-আগ্রহে আমিনার হস্ত পুনরায় ধারণ করিল এবং স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে বলিল "আমিনা! আমাকে ক্ষমা কর, আমার অমানুষিক কার্য্যের জন্য, অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি, তোমাকে আমি আমার করে নিব-ই এই আমার সঙ্কল্প। বল তুমি আমার হবে?"

আমিনা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল "ওস্তাদজি! সে'ত আর হবার উপায় নেই, তুমি অমানুষিক কাজ করেছ বলে প্রকাশ কচ্ছ, বাস্তবিক সেরূপ কিছুই-ত কর-নি। এত বড় দৃঢ়তর হবার শক্তি খুব কম লোকেরই সহজসাধ্য হয়ে থাকে। লাভের ভিতরই যে কেবল সার্থকতা বিদ্যমান থাকে এমন নহে। ত্যাগের ভিতর দিয়েই প্রকৃত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আভাস সূচিত হয়। তুমি মহৎ, তোমার অন্তর পবিত্র ভাবাপন্ন, তোমাকে লোক চক্ষে হেয় ও হীন সাজায়ে, স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করবার মত ইচ্ছা আমার নেই। ভগবানের আসনেই তোমাকে বসায়ে, পরিচর্য্যা করব, এর ভিতর দিয়েই আমার অন্তরের সমস্ত তৃপ্তি উপভোগ করবার সামগ্রী সংগ্রহ করে নিব। মাখামাখির ভিতর দিয়ে, আত্মতৃপ্তি সম্ভোগের আশা রাখি না। ওস্তাদজি! বেলা পড়ে এল, কাল দিয়ে, এখন যাই, যদি খোদা দিন দেন, তবে

একদিন মনের সমস্ত কথা তোমার নিকট প্রকাশ করে, এই "অভিশপ্ত" জীবনের জ্বালা অনেকটা প্রশমিত কর্‌ব।"

বৈরম আলী কাতরপূর্ণ দৃষ্টিতে আমিনার প্রতি চাহিয়া, জড়িতকণ্ঠে বলিল "আমিনা! আমি তোমাকে এতদিন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি নি, একটা মিথ্যা আশঙ্কায়, এত বড় রত্ন পায়ে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছি। তুমি যতই দৃঢ় হও,—তুমি আমার হবেই,—তুমিই আমার জীবনের কাম্য—সম্পদ।"

আমিনা বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "ওস্তাদজি! ক্ষমা কর। তবে এখন আসি, সম্পদে না হ'ক, অন্ততঃ বিপদে আমিনা চিরদিনই তোমার জন্য প্রাণপাত কর্‌বে, এই তার সঙ্কল্প। এ— হ'তে কোন দিনই বঞ্চিত করো' না।"

আমিনা আর মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা না করিয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে, কাজী সাহেবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। বৈরম আলী নীরবে কাজী সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত—আমিনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া, ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

রাত্রি আটটায় বিবাহ লগ্ন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কাজী সাহেবের বাড়ীতে বহু আত্মীয় ও অভ্যাগতের সমাগম হইয়াছে। একমাত্র কন্যার বিবাহে,—বহু রসাল আহারীয় সংগ্রহ করিয়া, কাজী সাহেব সকলকে আহার করাইতেছিলেন। সকলেই পরম উল্লাসে বিবাহ উৎসবে মাতিয়া গিয়াছিল। বৈরম আলী, হোসেনকে বর বেশে সজ্জিত করিয়া—কাজী সাহেবের বাহির বাটির সুসজ্জিত কক্ষে উপবেশন করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। বাড়ীর আড়ালে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িল,—তাহার শেষ আলোর আভায় পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া

উঠিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ক্রমে তিমিরভরা রাত্রিতে পরিণত হইল। আলোক মালায় চারিদিক সজ্জিত হইয়া, উৎসব বার্ত্তা চারিদিকে বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। কৃষ্ণা ত্রয়োদশী রজনীর অসীম আঁধারের বুক চিড়িয়া,—আলোক মালার তীব্র রশ্মিধারা, ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে,—মোখস পরিধান করিয়া, অস্ত্রধারী একদল দস্যু, কাজী সাহেবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই লাঠির আঘাতে সুসজ্জিত তৈজসপত্র ভাঙ্গিয়া চূড়মার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ীখানা ছন্নছাড়ার দশা প্রাপ্ত হইল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যাহারা বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিল, তাহারা গুরুতর আঘাতে বিচ্ছুরিত হইয়া, প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। কাজী সাহেব পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া প্রতিকারের জন্য প্রাণপণে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, কিন্তু দৈত্যের তাণ্ডব নৃত্যের নিকট সে সমস্ত শক্তি প্রতিহত হইয়া, একেবারে অসার হইয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দস্যুর দল, হোসেন ও মতিয়াকে ধরিয়া লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল: উৎসব আমোদ, মুহূর্ত্তে যেন শোকোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল। কাজী সাহেব মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। দুই চক্ষু দিয়া—দ্রুত ধারায় উষ্ণ অশ্রুর নির্ঝর প্রবাহিত হইতে লাগিল। বৈরম আলী কশাহতবৎ টলিয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। তাহার অনুতাপ-দীর্ণ অন্তরের অন্তস্তল হইতে আর্ত্ত ধ্বনি, মর্ম্মস্পর্শী রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল! ঈশানের দুর্য্যোগবিষাণ ঘোর রবে চারিদিকে বাজিয়া উঠিল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দিবা নিদ্রার ঘোর কাটাইয়া, ঈষৎ রক্তিমাভ নেত্রে নিদ্রালস গতিতে, বাদসা সাহেব, তাঁহার বিশ্রাম কক্ষের একখানা আরাম কেদারায় যাইয়া উপবেশন করিলেন।

ইতি পূর্ব্বেই ভৃত্য আলবোলায় মূল্যবান সুগন্ধি তামাক, বিশেষ পারিপাট্যের সহিত, সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল; বাদসা সাহেব হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক, কারুকার্য্য মণ্ডিত সর্পাকৃতি বৃহৎ নলটি মুখের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া অৰ্দ্ধ নীমিলিত নেত্রে, ধুম্র উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট অতিবাহিত না হইতেই,—একজন বাঁদী, ধীর পদবিক্ষেপে, বাদসার এক পার্শ্বে আসিয়া, নতমস্তকে অভিবাদন করিল এবং কোমলকণ্ঠে বলিল "খোদাবন্দ্! একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক আপনার সাথে দেখা কত্তে চাচ্ছে।"

বাদসা সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে বাঁদীর প্রতি তাকাইয়া, আগ্রহান্বিতকণ্ঠে বলিলেন "স্ত্রীলোক? সে আবার কে? কি প্রয়োজন আমার সাথে?"

বাঁদী বিনম্রকণ্ঠে বলিল "তা'কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন প্রত্যুত্তর পাইনি,—সাক্ষাতের নাকি তার বিশেষ প্রয়োজন।"

বাদসা সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া—তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "বেশ—তাকে পাঠিয়ে দেও।"

বাঁদী দ্রুত পদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল; কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি যুবতী স্ত্রীলোক বাদসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,—এবং মুচ্‌কি হাসিয়া, অপলকনেত্রে বাদসার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, সসম্মানে বাদসাকে অভিবাদন করিল।

বাদসা রূপসী যুবতীর মুখের প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া,— মোহাবিষ্টের মতই প্রশ্ন করিলেন "আমার নিকট কি প্রয়োজন তোমার?"

যুবতী একগাল হাসিয়া, নিতান্ত সহজভাবে বলিল "আপনি বাদসা, আপনার নিকট আমার কি প্রয়োজন, তার একটা তালিকা লিখে নিয়ে আস্‌তে ভুলে গেছি! এক কথায় বল্‌তে গেলে তার সার মর্ম্ম হচ্ছে, বাদসাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়েছে, তাঁকে দেখ্‌ব,—তাই এসেছি।"

বাদসা বিরক্তিরভাব দেখাইয়া বলিলেন "আমি বাদসা, হিসেব করে কথা বলো, বুঝতে পার্‌লে?"

যুবতী একগাল হাসিয়া বলিল "আমরা স্ত্রীলোক, চিরকালই হিসেব করে কথা বলে থাকি,—তা বাদসাই হন, আর যিনিই হন! আপনার যে সমস্ত ক্ষমতা আছে, তারও হিসেব আমি করে এসেছি,—ক্ষুদ্র স্ত্রীলোকের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ কর্‌লে, বাদসার মর্য্যাদা বৃদ্ধি কোন দিনই হয় না! তবে আমাদেরও যে একটা ক্ষমতা আছে,—তা হয় ত আপনি একেবারে অস্বীকার কত্তে পারেন না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাদসা সাহেব নিথর হইয়া বসিয়া থাকিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "তোমার এ সব বাজে কথা শুন্‌বার সময় আমার নেই—তোমার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করে,—বক্তব্য বিষয় বলে ফেল !"

যুবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল "আমার নাম আমিনা। তবে পরিচয়,—সেটা দিবার আপত্তি যথেষ্ট আছে। আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে,—ঘর ছেড়ে, বেড়িয়ে এসেছি আপনার আশ্রয় পাব বলে,—পরিচয় দিয়ে শেষটায় তিন কুলের মান মর্য্যাদা খোয়াতে চাই না, এ বিষয়ে ক্ষমা কর্‌বেন।"

বাদসা সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে আমিনার প্রতি তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যুবতী যেমন সুন্দরী, তেম্‌নি মুখরা,—কথা বল্‌তে কোনই সঙ্কোচ নেই, তিরস্কারেও ভরকে যায় না, এর সৌন্দর্য্যের ভিতর কেমন যেন একটা ভাবপ্রবণ মাদকতা রয়েছে,—যাতে সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে ফেলে। এ কে স্ত্রীলোক, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তা বের কত্তেই হবে। শেষে বাদসা সাহেব আগ্রহাতিশয্যে প্রশ্ন করিলেন "তোমার আসল বক্তব্য শুন্‌তে আমার খুবই আগ্রহ হচ্ছে, তুমি নিসঙ্কোচে বল্‌তে পার।"

আমিনা চোখ ঘুরাইয়া স্মিত মুখে বলিল "ঠিক অঠিক কিছুই নেই এর ভিতর, যা বলেছি তাই উদ্দেশ্য, অনেক দিন হতেই বাদসাকে দেখ্‌বার সাধ ছিল, আপনার অসীম কার্য্য তৎপরতার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, আপনার দেহ আকৃতি হয়ত সাধারণ মানুষ হতে অনেকটা বিভিন্ন,—কিন্তু এখন দেখছি খোদার হাতের একই সামগ্রীতে প্রজা ও বাদসার সৃষ্টি হয়েছে,—তবে—।"

আমিনার ব্যঙ্গ উক্তিতে বাদসা সাহেব বিচলিত হইয়া, তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "তবের---অর্থ কি ?"

আমিনা দৃঢ়স্বরে বলিল "তা বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না? আশ্চর্য্য! আপনি—এই ক্ষুদ্র বোধ শক্তি নিয়ে দুনিয়া শাসন করে যাচ্ছেন? পুরুষলোক চিরদিনই স্ত্রীলোককে জড়পদার্থ বলে উপহাস করে থাকে, খেলার সামগ্রী মনে করেই যথেচ্ছাচার করে থাকে, আপনি না পুরুষ, একটা অশিক্ষিত রমণীর মনের ভাব বুঝে উঠ্‌তে পারেন না!"

বাদসা তীব্র গর্জ্জনে বলিলেন "তোমার গর্দ্দানের মায়া নেই কি? জান,—এই মুহূর্ত্তে তোমাকে কি কত্তে পারি?"

আমিনা একগাল হাসিয়া বলিল "গর্দ্দানা দ্বিখণ্ডিত হবার ভয় করি বলেই ত—কথাগুলি একটুকুন ঘুরিয়ে বল্‌ছি! তবে আমি জানি, অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি ক্ষমতা বিস্তার করে,—কেবল কাপুরুষ যা'রা তা'রাই!"

বাদসার মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তে রক্তিমাভ ধারণ করিল, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন "তুমি যে কি বল্‌তে চাচ্ছ তা আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না,—তুমি এখন—এস্থান পরিত্যাগ কত্তে পার।"

আমিনা মুচ্‌কি হাসিয়া—চেয়ারের গাত্রে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া, নিতান্ত সহজভাবে বলিল "আমি যাব? সে—কি বাদসা সাহেব? যাব বলেই কি, এখানে এসেছি? আমি জানি, আপনি মোহের দাস, অসীম শক্তি সম্পন্ন হলেও, এমনি নির্ম্মমভাবে আমাকে তাড়িয়ে দেবার শক্তি আপনার নেই! এটা আমি আপনার চোখ মুখ দেখে ঠাওর করে নিয়েছি। তা ঠিক নয় কি বাদসা সাহেব?"

বাদসা সাহেব ভাবিতে লাগিলেন—কে এই রূপসী যুবতী? রূপে চারিদিক উজ্জ্বল করে ফেলেছে, বেশভূষায় ঐশ্বর্য্যের পরিচয় মাখান। এর দৃষ্টিতে না আছে কুণ্ঠা, না আছে বাধা, ফাল্গুন হাওয়ায়, সলিল উচ্ছ্বাসের মতই এর গতি ভঙ্গি! কথায় ঝাঁঝে সাতটা সুর যেন

নৃত্য করে বেড়াচ্ছে,—বাদসা নীরবে আমিনার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

আমিনা চোখ ঘুরাইয়া, একগাল হাসিয়া বলিল "অম্নি করে, অপলক চোখে কি দেখছেন আমার ভিতর? আমি ত আর জানওয়ারও নই, কিংবা জগতের একটা অষ্টম আশ্চর্য্যেরও কিছু একটা নই! আমি চাই আশ্রয়,—তা এতটুকুন আশ্রয় দিলে, বাদসার অফুরন্ত ধনভাণ্ডার কমে যাবে বলে মনে হয় না, বাদসা সাহেব! বলুন,—এতটুকুন দাবীও কি আমি কত্তে পারি না?"

আমিনার কথার ঘায়, বাদসার মন একেবারে চুড়মার হইয়া, শতধা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদম্য তৃষ্ণা তাঁহার মনের গোপন কোণে সজাগ হইয়া, তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—এ যেন স্বর্গের নন্দন কাননের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্প, বৃন্তচ্যুত হইয়া, তাঁহার কণ্ঠাভরণ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। বাদসা সাহেব মোহাবিষ্টের মতই আমিনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন "কিরূপ আশ্রয় পেলে তুমি সুখী হও?"

আমিনা ঝাঁঝের সহিত তীব্রকণ্ঠে বলিল "আমার মত গরীবের পক্ষে, কি আশ্রয় লাভ সম্ভবপর হ'তে পারে,—তাও আমাকে খুলে বল্‌তে হবে? আমি চাই বাঁদী হয়ে আপনার সংসারে থাকৃতে, তাতেই আমি ধন্যা হয়ে যাব। দিনান্তে যদি আপনাকে একবারও দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটে উঠে, তবেই আমার উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে মেনে নিব। এওকি হ'তে দিবেন না বাদসা সাহেব?"

বাদসা সাহেব বিস্ময়সূচক শব্দ ধ্বনিত করিয়া, জড়িতকণ্ঠে বলিলেন "সে কি? বাঁদী হয়ে থাকৃবে তুমি আমার এখানে?"

আমিনা একগাল হাসিয়া বলিল "তা নয় ত কি, বেগম হয়ে থাক্‌তে চাইব ?"

বাদসা সাহেব আমিনার মুখের প্রতি বিস্ময়াবিষ্টের মতই কয়েকবার তাকাইয়া, বলিলেন "যদি সে প্রার্থনাই কর, তবে তা'তেইবা দোষ কি ?"

আমিনা শ্লেষজড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব ! আমি গরীব, এত বড় আশা ত কোন দিনই মনে পোষণ কত্তে সাহসী হই নি। আশ্রয় যদি দেন, আপনার পরিচর্য্যার ভার যদি লাভ কত্তে পারি, তাতেই আমি কৃতার্থ হব।"

বাদসা সাহেব করুণ দৃষ্টিতে আমিনার প্রতি তাকাইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এ রত্ন কেবল বাদসারই বেগম হবার যোগ্যা, বাদসার কণ্ঠহার হয়ে থাক্‌লেই এর উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ হবে। আমার বেগমদের ভিতর এমনি রূপসা, বাগ্‌পটু, নির্ভীক, বুদ্ধি সম্পন্না, আর কেও আছে বলে আমার মনে হয় না। কাননের শ্রেষ্ঠ কুসুম বাদসার ভোগের জন্যই নিয়োজিত হয়ে থাকে, এ যখন স্বইচ্ছায় করায়ত্ত হয়েছে, একে কণ্ঠে ধারণ করেই ত মর্য্যাদা রক্ষা কত্তে হবে, আর বিশেষতঃ এত অল্প সময়ের ভিতর, এমনিভাবে, কোন যুবতীই আমার চিত্ত জয় কত্তে সক্ষম হয় নি। বাদসা প্রকাশ্যে আমিনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ছিঃ তুমি বাঁদী হয়ে কেন থাক্‌তে যাবে ?"

আমিনা তীব্রকণ্ঠে বলিল "কেন ? তাতে ত কোন দোষ দেখ্‌ছি না। তা'রাও ত আমার মতই মানুষ,---খোদা, বেগম হবার মত কপাল যা'দের গড়ে দেন নি, তা'দের পক্ষে বাঁদী হওয়া ছাড়া আর কোন আশ্রয়ই নেই—।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাদসা সাহেব দৃঢ় অথচ সহজ কণ্ঠে বলিলেন "আমিনা! খোদ বাদসা যদি তোমাকে কণ্ঠে তুলে নিয়ে, নিতান্ত আপন করে নিতে চায়, তাতে হয় ত তোমার কোন আপত্তির— ।"

কথায় বাধা প্রদান করিয়া আমিনা বলিল "বাদসা সাহেব! এতে আপনার অসীম ভাবপ্রবণতারই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। আমি শুনেছি যুবতী রমণী কিছু দিন বাদসার খেলার পুতুল বলেই গণ্য হয়ে থাকে, কিছুদিন পরে তাদের জীবনের আসল টুকুন নিঙড়ে নিয়ে, নিতান্ত আবর্জ্জনার মতই, তাদের প্রত্যাখ্যান করা হয়,—তবে এটা চিন্তা করে দেখবেন, তাদেরও অন্তরে অনুভূতির নির্ঝর ছুটে চলেছে, ভালবাসার অন্তঃসলিলা প্রস্রবণ তাদের অন্তরের অন্তস্তলেও প্রবাহিত থাকে। সেটাকে জোর করে টেনে ছিঁড়ে ফেলবার শক্তি তাদের থাকে না! এতটা জেনে শুনে, যে জিনিষ টুকুন এতদিন সযত্নে রক্ষা করে এসেছি, তা এক মুহূর্ত্তে আপনার চরণে বিকিয়ে দিয়ে, শেষটায় পথের ভিখারী হয়ে, পথে পথে আবর্জ্জনাময় জীবন নিয়ে ঘুরে বেড়াব? তা'ত হতে দোব না, আপনাকে এবং আপনার অন্তরের আন্তরিকতা, বিশেষ করে জেনে নিয়ে, তবেই আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করব।"

বাদসা সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেন "সে বিষয়ে তোমার কোনই আশঙ্কার কারণ নেই,—বাঁদী করে তোমাকে গ্রহণ করলে, তোমার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে না,—তোমাকে দেখার পর হতেই, আমার মন সত্যিই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তুমি আমার হও, এটাই হচ্ছে আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।"

আমিনা নীরবে দাঁড়াইয়া বাদসার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল, তোমাকে আকৃষ্ট করে, কাজ করবার জন্যইত আমি এই বড় জটিলতার ভিতর আপনাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে;

তুমি বাদসা—নিতান্ত অন্তঃকরণশূন্য স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ক,—তোমার কণ্ঠাভরণ হবার উপযুক্তা আমিনা কখনও হতে পারে না। প্রলোভনে করায়ত্ত কত্তে চাচ্ছ? সেটা তোমার ভুল ধারণা,—আমিনা তোমাকে কুকুরের চেয়েও অধিক ঘৃণা করে থাকে। তোমার অত্যাচারে শত শত নিরপরাধিনী রূপসী যুবতী,—অশ্রু জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে, সকলেই ভোগান্তে, দুদিনেই পরিত্যক্তা হয়ে, তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে চারিদিকের বায়ু তপ্ত করে তুলেছে; জোর করে কত রূপসীর সর্ব্বনাশ করে তুমি সম্ভোগের ইন্দন সংগ্রহ করেছ! এ স্বচক্ষে দেখে, আমিনা আপনাকে এমনি করে বিলিয়ে দিবে? তা হচ্ছে না, সে একজনকে তা'র যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে, তার কার্য্যে ব্রতী হয়েই আমিনা আজ তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বার মত কত বড় বিপদ সঙ্কুল পথে অগ্রসর হয়েছে। তার একমাত্র সম্বল খোদা,—তিনিই তাকে সকল বিপদের হাত হতে রক্ষা কর্‌বেন। আমিনা অতঃপর একগাল হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিল "বাদসা সাহেব! আপনার মত, আমিও আমার মনটাকে বিকিয়ে ফেলেছি,—তবে আপনাকে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবার পূর্ব্বে, আমাকে সকল দিক ভাল করে দেখে নিতেই হবে"

বাদসা সাহেব ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া আমিনার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আগ্রহ দৃষ্টিতে আমিনার প্রতি তাকাইয়া—বলিলেন "আমিনা! খোদা সাক্ষী করে বল্‌ছি—এই অল্প সময়ের ভিতর—তোমার সৌন্দর্য্যের মোহে, বাক্‌চাতুর্য্যে তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে ফেলেছ,—আমি তোমাকে বেগম করে নিয়ে,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে আসন নির্দ্দেশ করে দোব।"

আমিনা কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া বলিল "বাদসা সাহেব! বেগম হবার পূর্ব্বে,—আপনার অন্তরটাকে ভাল করে জেনে নেবার

ইচ্ছে হয়েছে। আমাকে এতটাই অনুগ্রহ কত্তে যদি ইচ্ছে করে থাকেন,—তবে আমাকে তিনটী মাসের সময় দিন। আমাকে পৃথকভাবে বাস কর্‌বার আয়োজন করে দিন! বেগমের সমস্ত পূর্ণ অধিকার আমাকে দিন—সর্ব্বত্র আমার অবাধ চলাফেরার বন্দোবস্ত করে দিন। ঐ তিন মাস আমি দূরে দূরে থেকে আপনার অন্যান্য পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ কর্‌ব। এর পরে আপনাকে বুকে করে,—অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দিব। এ প্রার্থনা মঞ্জুর কত্তে হয়ত আপনার কোনই আপত্তির কারণ হবে না।"

বাদসা পরম উল্লাসে আমিনার প্রতি তাকাইয়া, নিতান্ত সহজভাবে বলিলেন "তাই হ'বে আমিনা। এ পুরীতে আজ হতে তোমার সর্ব্বত্র গতায়তের পূর্ণ অধিকার হল,—একখানা সুরম্য কক্ষে তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিচ্ছি,—কোন অসুবিধা যাতে না হয়—তা'র সমস্ত আয়োজন কর্‌বার হুকুম প্রচার কচ্ছি।" বলিয়া বাদসা সাহেব কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

ইহার পর একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমিনা এই অল্প সময়ের মধ্যে সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিস্তারের সুবিধা করিয়া লইয়াছে। দিনান্তে বাদসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নানা হাব ভাবে,—তাঁহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিতে লাগিল,—বাদসা সাহেব আমিনার ছবি ধ্যান করিয়াই স্বীয় চিত্তকে মসগুল করিয়া রাখিলেন এবং আমিনার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য দাসদাসী নিযুক্ত করিলেন।

সমস্ত কাজের ভিতর আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখিয়া, আমিনা,—মতিয়া ও হোসেনের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের প্রসঙ্গ এমনি সতর্কতার সহিত

গোপন রাখা হইয়াছিল যে,—ভিতরের সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা কাহারও করায়ত্ব ছিল না।

আমিনা অনেক চিন্তার পর স্থির করিল, দৌলতন্নেছাকে এ বিষয়ে তাহার সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সে জানে, মতিয়া ও হোসেনের বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন করাইতে পারিলে, তাহার পক্ষে সাহাজাদাকে লাভ করিবার পথ অনেকটা সুগম হইবে। আমিনা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক, বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া, অসীম সমবেদনা প্রকাশ করিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দৌলতন্নেছার বিশ্বাস ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিল। মতিয়া ও হোসেনের সে যে একজন শুভানুধ্যায়ী, তাহাও বিশেষ সতর্কতার সহিত দৌলতন্নেছার নিকট গোপন রাখিল। সরলা বালিকা দৌলতন্নেছা, অকপট চিত্তে, আমিনার নিকট তাহার সমস্ত দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিয়া, অন্তরের পুঞ্জীভূত জ্বালাভরা ব্যাকুলতার উপশম করিল।

* * * *

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বৈশাখের রৌদ্র, রুদ্র মূর্ত্তিতে মৃত্তিকা উত্তপ্ত করিতেছিল। বাদসার অন্দর মহলের সকলেই স্ব স্ব কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছিল। আমিনা বিশ্রামান্তে, ধীর পদ বিক্ষেপে দৌলতন্নেছা বিবির কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল। দৌলতন্নেছা, এতক্ষণ নীরবে বসিয়া, বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখে সাহাজাদার ফটোগ্রাফখানা, দুই হস্তে ধারণ করিয়া অবলোকন করিতেছিল। হঠাৎ আমিনাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, ফটোখানা একপার্শ্বে লুকাইয়া রাখিয়া, নিতান্ত সহজভাবে আমিনার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমিনা দৌলতন্নেছার অন্তরের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "বোন্! তুমি কেন এম্‌নি করে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিচ্ছ। আমি শুনেছি, মতিয়া ও হোসেনকে দস্যুর দল বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। এ অবস্থায় তাদের খোঁজ না পেলে, সাহাজাদার সাথে তোমারই বিয়ে হবে বলে মনে হচ্ছে—" বলিয়াই প্রত্যুত্তরের আশায়, তীব্র দৃষ্টিতে আমিনা দৌলতন্নেছার মুখের প্রতি তাকাইল। এই প্রশ্নের উত্তরে তাহার নিকট হইতে মতিয়ার ও হোসেনের কোন সন্ধান পাইবার আশায়ই, আমিনা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিল।

দৌলতন্নেছা আমিনার অন্তরের ভাব ঠিক বুঝিতে পারিল না। সরলা বালিকা একটী দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, বলিল "তোমাকে আমি নিতান্ত আপনার জন বলেই ধরে নিয়েছি। আমি এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে চাই, তুমি যদি বিষয়টা গোপনে রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দাও,—তবে সব কথা তোমাকে খুলে বল্‌তে পারি।"

আমিনার অন্তর উৎফুল্লে নাচিয়া উঠিল; মনের ভাব গোপন করিয়া, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বলিল "সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমাকে যা বলবে, তা চিরদিনই গোপনে রাখব। এতদিন আমার ব্যবহার দেখে, তুমি কি আমাকে এতটা বিশ্বাস কত্তে পার না?"

দৌলতন্নেছা একটুকুন অপ্রতিভের ভাব দেখাইয়া, অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল "দিদি! মতিয়া ও হোসেন আলী দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হয়-নি। বাদসার অনুচর,—দুজনাকে কৌশলে অপহরণ করে, নির্জ্জন কারাকক্ষের বিভিন্ন কামরায়, পৃথকভাবে, আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। সে স্থানের সন্ধান করবার কারো ক্ষমতা নেই। বাদসার বিশ্বস্ত লোক সর্ব্বদা তাদের পাহারায় নিযুক্ত আছে। মতিয়াকে পনর' দিনের সময়

দেওয়া হয়েছে,—সে যদি স্ব ইচ্ছায় সাহাজাদাকে বিবাহ করতে সম্মত না হয়, তবে পনর দিন অন্তে, মতিয়ার সাক্ষাতে, হোসেনের মস্তক দেহ হতে ছিন্ন করে ফেলবে! এরপর আরও পনর দিনের ভিতর যদি মতিয়ার মত পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তারও মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, এ হচ্ছে বাদসার আদেশ। এ সমস্ত কাজ বিশেষ গোপনেই অনুষ্ঠিত হবে,—কারো জানবার অবকাশ হবে না! আজ দশটি দিন পার হয়ে গেছে, আরও পাঁচটা দিন পর,—যা হয় একটা কিছু হয়ে যাবে।"

দৌলতন্নেছার উক্তিতে আমিনার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার ম্লান বিমর্ষ নেত্রে একটা উৎকট বেদনার ছায়া প্রকটিত হইল। আমিনা অতি কষ্টে আত্মগোপন করিয়া বলিল "বোন! এ অবস্থায়, আমি তোমার কি সাহায্য কত্তে পারি? ঐ নিরীহ প্রাণী দুটাকেও-ত বাঁচাবার একটা ফিকির করার দরকার।"

দৌলতন্নেছা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিল "সে বড় কঠিন সমস্যা। তবে যদি কেহ, কোন উপায়ে, কারাগৃহ হতে, দুজনাকে মুক্ত করে,—দেশান্তরে পাঠিয়ে দিতে পারে, তবেই দু'দিক বজায় থাকতে পারে। এত বড় কঠিন কাজ সমাধা করতে, বড় সহজ সাধ্য বলে মনে হয় না।"

আমিনা প্রায় পাঁচ মিনিট কাল হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। শেষে উত্তেজিত স্বরে বলিল "বোন্! আশীর্ব্বাদ কর,—আমি যেন তোমাদের এই কাজে, প্রাণপাত করেও সকলের আশা পূর্ণ কত্তে পারি। তবে বিষয়টি বিশেষ গোপনেই রাখবে, এই আমার অনুরোধ। তোমার সাথে সাহাজাদার মিলন যেদিন সংঘটন করিয়ে দিতে পারব, সেদিন আমার

এই অসীম উদ্বেগের অবসান হবে। তবে এখন আসি”—বলিয়া আমিনা ধীরে ধীরে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাদলার দিন,—অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর, আকাশে,—মেঘের ফাঁকে,—সূর্য্যদেব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কাল মেঘের পার্শ্বে, সাদা মেঘগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া,—নীল আকাশের ম্লান-বিষণ্ণ-ছবিখানিকে যেন অনেকটা উজ্জ্বলতর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। এমনি সময়ে, একটি সুসজ্জিত ছোট কামরার একপার্শ্বে, জানালার সম্মুখে, দৌলতন্নেছা একাকী উপবেশন করিয়াছিল। জানালার উপর পাতলা সবুজ রঙের একখানা পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, পর্দ্দার একপার্শ্বে, মুখ বাহির করিয়া, দৌলতন্নেছা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়াছিল।

আকাশ যদিও, প্রতিদিনের মত, তেমনি নীল, বিপুল, দেখাইতেছিল, কিন্তু সেই দৃশ্য, তাহার মনকে, পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত আকাশ যেন, সাহাজাদার অন্তরের মতই, ভাবান্তরের ক্রূরতায়, লীন হইয়া গিয়াছিল। ইদানীং তাহার মনে হইতেছিল,—বিশাল সুনীল আকাশার্দ্ধ যেন, ভাঙ্গা দালানের ছাদের মতই, তাহার মস্তকে পতিত হইয়াছে,—যাহার রুদ্ধ চাপে সে যেন দলিত ও আহত হইয়া, আড়ষ্ট অভিভূতবৎ জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে! তাহার বাহিরটা যদিও রুদ্ধ-স্রোত-নদী-বক্ষের মতই স্থির দেখাইতেছিল,

কিন্তু বুকের ভিতর একটা প্রবল হাহাকার, হৃদ-যন্ত্রের পতন উত্থানের সহিত, অরুন্তুদ যন্ত্রণার তালে বাজিতেছিল !

দৌলতন্নেছা বিবির বয়স পঞ্চদশের অধিক না হইলেও, সে যে বয়সের অনুপাতে, অনেকটা অধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল,—তাহা তাহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলেই প্রতীত হইতেছিল। তাহার স্নিগ্ধ-গোলাপী-রঙের-দেহে, একটা মনোরম মাধুর্য্যের প্রলেপ মাখান ছিল। পরিপূর্ণ অটুট স্বাস্থ্য ও উচ্ছ্বাসিত সৌন্দর্য্যের জোয়ার তাহার দেহে, তরঙ্গায়িত হইয়াছিল। সে তাহার সুঠাম-ক্ষীণ-দেহ বল্লরী লইয়া যেখানেই উপস্থিত হইত, সেখানেই কেমন এক শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইত ! তাহার বেশভূষায় ইদানীং কোনই পারিপাট্য ছিল না,—মুখের চির উজ্জ্বল হাসিটুকুন যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল ! চোখের কোণে, অশ্রু-বিন্দু ও অভিমানের একটা অসীম দ্বন্দ্ব, সর্ব্বদাই, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল ! যিনি তাহাকে এই অশান্তিময় জীবন সমস্যার মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিল, তাঁহার প্রতি একটা দুর্জ্জয় অভিমানের উৎস আত্মপ্রসারণ করিয়া, নয়নের তপ্ত-অশ্রুধারাকে, রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল !

দৌলতন্নেছা বিবি—নবাব সাহেবের দূর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রী। অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিল। ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয় বলিতে সংসারে তাহার কেহই ছিল না। এই নিঃসহায় বালিকা, বাদসার সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়া, খোদ বেগম সাহেবার মাতৃ-স্নেহ-ধারায়, স্বীয় চিত্তকে অভিসিঞ্চিত করিয়া লইয়াছিল ! বেগম লুৎফুন্নেছা, প্রথম দর্শনেই, স্বর্গের কুসুম সদৃশ, সদা হাস্য বিকশিতা নয়নানন্দ-বর্দ্ধক অনাথা শিশুটিকে ভালবাসিয়াছিলেন ! তাঁহার ব্যবহারে মনে হইত,

তিনি যেন, খোদার আদেশে, অজ্ঞাত কোন স্বপ্নরাজ্য হইতে অবতীর্ণা হইয়া, অমৃতের উৎস লইয়াই, বালিকার অনাদৃত ও ঘাতপ্রতিঘাত পূর্ণ, প্রচ্ছন্ন উদ্বেগভরা অন্তরে, অসীম পুলক-স্পন্দন প্রবাহিত করাইয়া দিয়াছিলেন!

শৈশবকাল হইতেই দৌলতন্নেছা সাহাজাদার সহিত একত্র খেলাধূলা করিয়া কাটাইয়াছিল! ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এক অজ্ঞাত ভাব প্রবণতার ফলে, উভয়েই উভয়ের প্রতি, চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইল! দৌলতন্নেছার অবাধ-স্বচ্ছন্দভাব, আন্তরিকতাময় আচরণ, কুণ্ঠাশূন্য—নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ সহৃদয়তা, সাহাজাদার অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল! ক্রমে তাহাদের অন্তরের ভিতরকার উত্তাল শোণিত স্রোত, এতই উদ্দামভাবে নৃত্য করিতে লাগিল যে, তাহারি গতিবেগে, তাহাদের অন্তরের সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ছিন্ন হইয়া গেল। সাহাজাদা, দৌলতন্নেছাকে জীবন সঙ্গিনী করিয়া লইবার সঙ্কল্প, নিতান্ত সহজভাবে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না! যাহাকে জীবনের অরুণ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া, যৌবন পথে টানিয়া লইয়াছিল, তাহাকে জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত স্নেহ ভালবাসার প্রচুরতায় অভিষিক্ত করিতে সাহাজাদা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দৌলতন্নেছা শান্ত, সংযত, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যতার সহিত অটল মূর্ত্তিতে চলিতে চেষ্টা করিলেও, সাহাজাদার স্নেহ-প্রবণ উদ্দাম আগ্রহের নিকট মস্তক অবনত করিয়া, একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। উহাদিগের মেলামেশার গভীরতা লক্ষ্য করিয়া, বাদসা ও বেগম সাহেবা, উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন!

হঠাৎ দৈবদুর্ব্বিপাকে, মতিয়াকে দেখার পর হইতেই, সাহাজাদার অন্তরে, অসীম ভাবান্তর উপস্থিত হইল! একটা অননুভূত,—মতিয়াকে

লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড তরঙ্গ, সবেগে তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত থাকিয়া, তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। মতিয়ার স্নেহ-প্রবণ-মূর্ত্তি, সাহাজাদার অন্তরের নিভৃত কোণে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চারিদিক একটা বিশাল শূন্যতায়, শুষ্ক মহামরুর মতই, ধূঁ-ধূঁ করিতে লাগিল! দৌলতন্নেছার প্রতি সাহাজাদার কোনদিনই যেন বিন্দুমাত্র স্নেহের টান ছিল না, এরূপ একটা ভাব, তাঁহার কঠোর নির্ম্মম তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণের ভিতরই প্রকাশ পাইত!

বেগম লুৎফুন্নেছা অনেক বুঝাইয়াও, পুত্রের মতের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলেন না। তিনি দৌলতন্নেছার বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, একটা অসীম অশান্তি বহ্নিতে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন! বাদসার নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়াও যখন, কোনই প্রতীকার করাইতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

অতীতের বহু সুখ দুঃখ পূর্ণস্মৃতির অনুসরণ করিয়া দৌলতন্নেছা, উদ্বেল-ব্যাকুল হৃদয়ে, বহুক্ষণ ধরিয়া জানালার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক, আপন মনে ভাবিতে লাগিল, কোন্ পাপে আমার এমন দশা হল? আশৈশব যাকে অন্তরের সমস্ত স্নেহ-মায়া-ধারায় অভিষিক্ত করে, নিতান্ত আপন করে নিয়েছিলুম, যার সামান্য অদর্শনে অন্তর একেবারে শতধা হয়ে যেত, তাকে এম্নি করে পর হতে দেখে, নূতনভাবে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যে পাচ্ছি না! হা খোদা! যাঁকে এম্নি করে আপন করে নিতে দিয়েছিলে, কোন্ দোষে আবার কেড়ে নিয়ে, নির্ম্মমের মত এমনি করে অপরকে বিলিয়ে দিতে চাচ্ছ? মতিয়া,—হায়! সে খুবই ভাগ্যবতী;—আমার "যথা সর্ব্বস্ব" তাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, এ তার অসীম সৌন্দর্য্য প্রভাবের ফল! খোদা আমাকেও যদি সে সমস্ত আকর্ষণী

শক্তি দিয়ে গড়িয়ে দিতেন, তা হলে এম্‌নি ভাবে,—সব খোয়ায়ে, একেবারে রিক্ত হবার আশঙ্কায় আমাকে এতটা বিব্রত হতে যে হতো না! যা'কে পাবই না, তাঁকে ভালবাস্‌তে দিলে কেন? যদি আকাঙ্ক্ষার স্ফূরণ বুক ছাপিয়ে উদ্বেলিত হবার আয়োজন করে দিলে, তবে তাঁকে পাহাড় প্রমাণ ব্যবধানের ভিতর টেনে নিয়ে গেলে কেন! এ তোমার কোন্ ছলনা? তুমি যদি মানুষের অন্তর নিয়ে, এমনি খেলাই চিরদিন খেলে থাক, তবে মানুষ কেন তোমাকে স্নেহের পীযুষ ধারায় অভিষিক্ত করে, তোমাতে সবই নির্ভর কত্তে চায়? যিনি সর্ব্বক্ষণ আমার নয়ন মণির মতই আমাকে ধরা দিয়েছেন, কোন্ দোষে আজ তিনি দিনান্তেও একবার দর্শন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন? তিনি মতিয়াকে চান! তিনি মতিয়ার হবেন? তাতে যদি তাঁর সুখ হয়, তাতে আমি বাধা দিবার কে? তবে মতিয়া যে তাঁকে চায় না, তিনি কেন মতিয়ার এতবড় অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য—পায়ে ঠেলে দিয়ে, তা'রই সাহচর্য্যের জন্য এতটা উন্মাদ হয়েছেন? মতিয়ার ঘৃণা ব্যঞ্জক কঠোর মুখ ভার ও অসীম অবজ্ঞাসূচক প্রত্যাখ্যান, তিনি কেন এমনি করে, মাথা পেতে নিয়ে, তাকে করায়ত্ত করবার জন্য এতটা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন? হা খোদা! এ বিষয় তুমি তাকে বুঝতে দাওনা কেন? তার এতবড় অপমানসূচক প্রেরণার কথা মনে হলে আমার অন্তর যে শতধা হয়ে ভেঙ্গে পড়্‌তে চায়! আমি ত তাঁর রয়েছিই, আমিত কোন দিনই তাঁর প্রতি কোন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিনি, এ—অন্তরে নিহিত শ্রেষ্ঠ-স্নেহ-অর্ঘ্য দিয়েই ত তাঁকে পূজা কত্তে চেয়েছি, তাঁর তৃপ্তির জন্য, অন্তরপ্লাবা উচ্ছ্বাস নিয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিতে আমিই-ত চাইছি,—কেন তিনি তা পদদলিত করে, তাঁর আত্মমর্য্যাদা ক্ষুন্ন কত্তে ব্যস্ত হয়েছেন! হায়! কে বলে দিবে, কেন এমন হল! তাঁকে আর তেমনি ভাবে ফিরিয়ে যে

আর পাবই না! তাঁকে পাব না? সে—কি? তিনি যে আমারি ছিলেন! এখনও আছেন—চিরদিনই থাক্‌বেন। তিনি ছেড়ে গেলেও ত তাঁর স্মৃতি সম্বল করে, তাঁর ছবি অন্তরে আঁকড়ে ধরে, জীবন কাটিয়ে দিব। তিনি যতই পর হতে চান না কেন, অন্তরের গোপন কোণে তিনি যে আমারি থাক্‌বেন! এ হতে বঞ্চিত কর্‌বার শক্তি কারো নেই-ই! এরূপ এলোমেলো, নানা চিন্তার আঘাতে দৌলতন্নেছা একেবারে অধীর হইয়া উঠিল! সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; শেষে বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল! ভাবিতে লাগিল, আমিনা দিদির নিকট গেলে হয় না? তিনি-ত আমাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখে থাকেন, তাঁর কথাগুলি কতই যেন স্নেহ-মাখা, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। অতঃপর দৌলতন্নেছা ধীর পদবিক্ষেপে আমিনার কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিল!

. . .

বাদসার প্রাসাদের, এক প্রান্তে, একটি নির্জ্জন কক্ষে আমিনা বাস করিত। দৌলতন্নেছা প্রাসাদের কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া, শেষ কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, সাহাজাদা, একটি জানালার পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া, বাহিরের দিকে, দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া রহিয়াছে! দৌলতন্নেছা মুহূর্ত্তের মধ্যেই অনড়, অসাড় পুত্তলিকাবৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! তাহার চলিবার শক্তি যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সাহাজাদার দৃষ্টি সহসা দৌলতন্নেছার মুখের উপর নিপতিত হইতেই,—নিতান্ত অপরাধীর মতই মস্তক নত করিল। প্রায় দশ মিনিট কাল, অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সাহাজাদা ধীরে ধীরে দৌলতন্নেছার সম্মুখে অগ্রসর হইল, এবং স্নেহ বিজড়িত কণ্ঠে বলিল

"দৌলত! তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন? কোন অসুখ বিসুখ হয় নি-ত?"

দৌলতন্নেছা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না,—সুধু সাহাজাদার মুখের প্রতি তাকাইয়া মস্তক নত করিল।

সাহাজাদা কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "তোমার অসুখের কথা আমাকে কেউ-ত কিছু বলেনি,—তোমার চেহারা দেখে মনে হয়, তুমি খুবই গুরুতর অসুখে ভুগ্‌ছ! আমি আজই হেকিম ডাকিয়ে, তোমার চিকিৎসা র ব্যবস্থা করে দোব।"

দৌলতন্নেছা সাহাজাদার উক্তিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই দুর্জ্জয় অভিমানে, তাহার অন্তর নিতান্ত বিদ্রোহী হইয়া গেল। সে অসহিষ্ণুর ভাব দেখাইয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল "না— আমার-ত কোন অসুখ হয়-নি! হেকিমের কোনই প্রয়োজন আস্‌তে পারে না।"

সাহাজাদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "তোমার শরীর যে আধখানা হয়ে গেছে,—অসুখ হয়নি বললেই-ত আমি মেনে নিতে পাচ্ছি না,—আর কিছুদিন এভাবে থাক্‌লে,—বাঁচবার আশা—।"

দৌলতন্নেছা কথায় বাধা দিয়া বলিল "মরণের কথা বল্‌ছ—? তা আমার মরণ হ'লে-ত সব দিকই রক্ষা পে'ত, তা'ত হবেই না! তুমি যে দিন হ'তে আমাকে এমনি ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছ, সে দিন হ'তেই আমি মৃত্যুর কামনা কচ্ছি, আমার মৃত্যু যে খুবই বাঞ্ছনীয়!" দৌলতন্নেছা বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল।

সাহাজাদা একটুকুন বিচলিত হইল,—শেষে কোমল কণ্ঠে বলিল "দৌলত,—তা তুমি বল্‌তে পার। আমি পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়ে

পেতে কতনা চেষ্টা করেছি, কৈ—কোন ফল-ত হল না! অন্তরের পিপাসা যেন, ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আমাকে ক্ষমা কর।"

দৌলতন্নেছা সাহাজাদার উক্তিতে একেবারে মুস্‌ড়িয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ছিন্ন হইয়া গেল। নিতান্ত পাগলের ন্যায়, তীব্রকণ্ঠে বলিল "প্রিয়তম! এ তোমার দোষ নয়,—এ আমার কপালের দোষ, আমি ক্ষুদ্র বালিকা, এখনও অন্তরকে তেমনি ভাবে গড়ে নিয়ে, দুঃখের মাঝে, সুখের স্বাদ গ্রহণ কত্তে পারি নি। আমার যদি অদৃষ্ট ভাল হ'ত, তবে তোমাকে এমনি ভাবে, পর হতে দেখ্‌তে হ'ত না।"

সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "তুমি যা' বলছ তা আমি সবই বুঝতে পাচ্ছি,—তবে...... ।"

দৌলতন্নেছা কথায় বাধা দিয়া বলিল "তবে কি? মতিয়াকে পাওয়া তোমার কাম্য, তাই বল্‌তে চাচ্ছ? তা'তে কোন বাধা দিবার আকাঙ্ক্ষা আমি রাখি না! তোমাকে স্বামী রূপেই বরণ করেছি, স্বামীরূপেই, আমার অন্তর দখল করে থাক্‌বে। তুমি পরিত্যাগ করলেও আমি জানি,—আমি তোমারি।"

সাহাজাদা নির্নিমেষ নয়নে দৌলতন্নেছার প্রতি তাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "দৌলত! সে আশা আর নেই, ক'দিন হয়, আমি বাবাকে আমার মত জানিয়ে দিয়েছি, তিনি জানিয়েছিলেন, মতিয়াকে আমি গ্রহণ কত্তে চাইলে,—তোমাকে তিনি সৎপাত্রে অর্পণ করে, তোমাকে সুখী কত্তে চেষ্টা করবেন। পাত্র তিনি নাকি এক রকম ঠিকই করে রেখেছেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দৌলতন্নেছা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "তুমি কি মত প্রকাশ করেছ,—আমাকে জানাবে কি? আমার নিকট কিছুই গোপন করো' না—এই আমার অনুরোধ!"

সাহাজাদা বিনম্র কণ্ঠে বলিল "কোন কিছুই গোপন করব না তোমার নিকট, আমি মতিয়াকে গ্রহণ করবার সপক্ষে মত দিয়েছি! মতিয়া যদি স্বইচ্ছায় বিবাহে মত দেয়, তবে আমার মনে হয়, হোসেন আলীর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। হোসেন আলী যেমন সুশ্রী, তেমনি সুপণ্ডিত, এমন ভাল ছেলে আমাদের এ অঞ্চলে আর নেই বল্লেই হয়। দৌলত! অতীতের সব ভুলে যাও। নূতন ভাবে আবার জীবন পত্তন করে, সুখী হও, এই আমার একান্ত অনুরোধ। বাবা ভয়ানক জিদী লোক, এ বিষয়ে তিনি অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করাবেনই, কোন কিছুতেই কিছু আটকাতে পারবে না। তুমি আমাকে ভুলে—"

কথায় বাধা দিয়া দৌলতন্নেছা দৃঢ়স্বরে বলিল "তোমাকে ভুলে অপরকে আপন করে নিতে উপদেশ দিচ্ছ? তুমি পুরুষ, এ কথা তোমাদেরই সাজে, তুমি যদি আমার অন্তরের ভিতরটার সাড়া নিতে পারতে, কত বড় আগুন বুকে জ্বালিয়ে পুড়ে মরছি, তা যদি অনুভব কত্তে চাইতে, তবে এমনি ভাবে আমাকে পায়ে ঠেলে দিতে চাইতে না। তোমার অন্তর যে এত কঠিন, তা'ত এখনও ধারণা কত্তে পাচ্ছি না! তবে মনে রেখো,—তুমি মত দিলেই যে আমার সে ভাবে চলতে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। তুমি মতিয়াকে গ্রহণ কর, তুমি মতিয়ার হও, কোন বাধা দিব না, বাধা দিবার শক্তিও আমার নেই।

তবে আমি তোমা ছাড়া আর কারো'ই হতে পারি না, বা হবো না, এটা তুমি বেশ জেনে রেখো। তুমি আমার ছিলে,—এখনও আছ,—যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তুমি আমারই থাকবে। তুমি আপনাকে ইচ্ছামত বিলিয়ে দিতে পার,—কিন্তু প্রকৃত স্ত্রী, কোন দিনই,—এমনি করে ভালবাসাকে যাচাই কত্তে পারে না। আমার জীবনের যা কাম্য, যা প্রিয়,—সকলই তোমার চরণে অর্পণ করেছি,—ফিরিয়ে নেবার অধিকার ত আমার নেই! যদি এ বিষয়ে কেহ বলপ্রয়োগ কত্তে চায়,—আমাকে অপরের হস্তে জোর করে বিলিয়ে দিতে চায়,—তবে মনে রেখো,—দৌলত! সেদিন পৃথিবী ছেড়ে যেতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না! সংসারের লীলা সাঙ্গ করে,—পরলোক বলে যদি কিছু থাকে,—সেখানে গিয়েও তোমার ধ্যান করব,—উদ্‌গ্রীব আগ্রহে তোমার অপেক্ষা করব,—এতে বাধা দিবার ত কেউ থাকবে না! প্রিয়তম! তুমি মনে রেখো,—খোদা বলে যদি কেউ থাকেন,—তবে এই মাতৃ পিতৃহীন অনাথার আকুল-আহ্বান একদিন তিনি শুনবেনই—। তিনি তাঁর নিরপেক্ষ বিচার আসনে বসে, দেখিয়ে দিবেন, তুমি আমারি জীবন দেবতা,—তুমি আমারি সর্ব্বস্ব—।" দৌলতন্নেছার আর বাক্য স্ফূরণ হইল না,—কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া আসিল। সে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন যুগল আবৃত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিল। শেষে উন্মত্তের ন্যায়—স্খলিত চরণে স্বীয় শয়ন কক্ষের শয্যায় আশ্রয় লইয়া, রুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল। তাহার সেই ক্রন্দন উচ্ছ্বাস, কতটুকুন মর্ম্মস্পর্শী ও অসহনীয়,—সাহাজাদা তাহার কোন হিসাব করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি না,—কে বলিতে পারে?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বাদসার প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে, সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত, বহু স্থান বিস্তৃত কারাগার,—তুইটী অংশে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণাংশের কারাগৃহে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীগণ বন্দী থাকিয়া, কঠিন শাস্তি ভোগ করিত! বায়ু-সম্বন্ধ-শূন্য তমসাবৃত সেই সমস্ত ক্ষুদ্র কক্ষগুলি, দিবাভাগেও বন্দীদিগের ভীতি উৎপাদন করিত!

উত্তরাংশের কারাকক্ষগুলি সাধারণ বসতবাসের উপযোগী করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত অথচ বাদসার কোপ-দৃষ্টিতে নিপতিত, তুর্ভাগাগণ সাধারণতঃ এই অংশে বন্দীরূপে বাস করিত। এই সমস্ত বন্দীদের তত্ত্বতালাসের ভার খোদ বাদসাই গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহারি আদেশ অনুসারে,—তাহাদের বসন, ভূষণ ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করা হইত।

বেলা তিনটা বাজিয়াছিল,—গ্রীষ্মকাল, চারিদিক নিস্তব্ধ, বাতাস যেন থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিকণাবর্ষী গভীর তপ্তশ্বাস মোচন করিয়া,—অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। এম্‌নি সময়ে আমিনা,—ধীর-পদ-বিক্ষেপে,—উত্তরাংশের কারাগৃহের সম্মুখীন হইল। তাহার উৎসাহ-দীপ্ত নেত্রের সম্মুখে, বিশ্ব-জগৎ যেন একটা অনিন্দ্য নাট্য অভিনয়ে পরিণত হইয়াছিল! পার্শ্বে ধূলি-সমাকীর্ণ রাজপথ,—তৎপার্শ্বে উচ্চাবচ প্রাসাদ শ্রেণী, সম্মুখের বাগানে ফুলফল ভারাবনত—পাদপরাশি,—সকলই যেন আজ আমিনার নিকট মঙ্গলছবিবৎ প্রতিভাত হইতেছিল।

আমিনা সাহঙ্কার বিজয়োৎফুল্ল নয়নে, প্রহরীর মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ সংন্যস্ত করিয়া, চাপা মৃদু হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিল "তোমার নামখানা কি প্রহরী ?"

প্রহরী এতক্ষণ, একখানা সুতীক্ষ্ণ তরবারি স্কন্ধে ফেলিয়া, কারাগৃহের তোরণ দ্বারের সম্মুখে, অন্য মনস্ক ভাবে, পায়চারি করিতেছিল। সহসা রমণী কণ্ঠের করুণ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতেই, সে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং আমিনার প্রতি চক্ষু ঘুরাইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক উত্তর করিল "বেগম সাহেবা !—এই নফরের নাম,—তাজমল হোসেন।"

তাজমলের বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চান্ন বৎসর। দেহ অনেকটা স্থূল, বর্ণটি ঘন কৃষ্ণ, মস্তকের সম্মুখের দিক কেশ শূন্য। সম্মুখের দুইটী দন্ত, চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। জীবন সংগ্রামে তাজমল এক দরিদ্র গৃহস্থের বিধবা রূপসী কন্যাকে "নিকা" করিয়াছিল। পত্নী হামিদার বয়স এখন চল্লিশের কোঠায়।

আমিনা স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল "তা—বেশ, সংসারে আর কে আছে তোমার ?"

তাজমল মস্তক নত করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করে উত্তর করিল, "বিবি,—! একটি কন্যা ও চারি বছরের একটি পুত্র ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই আমার।"

আমিনা সহানুভূতি সূচক ভঙ্গিতে বলিল "সারাটি দিনই-ত ঠাঁয়-দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়ে যাচ্ছ,—তোমার সংসার কে দেখে ?"

তাজমল আবেগ উথলিত ভারি গলায় উত্তর করিল "খোদা কোন প্রকার চালিয়ে দেন,—আমি ক্ষুদ্র নফর, আমাদের সুবিধে বলে কি থাকতে পারে ! তবে……।"

আমিনা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "তবে"—কি—তাজমল ?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তাজমল হোসেন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "বেগম সাহেবা! আমি চার চারটি ছেলে হারিয়ে,—এই শেষ বয়সে, একটি ছেলে পেয়েছি। সে আমার কাছেই সর্ব্বক্ষণ থাকতে চায়, তা'র কথাগুলি বড়ই মিষ্টি, তা'র কথা শুনলে, সকল কষ্টের ভিতরও আমাকে একটা শান্তি এনে দেয়! এ-ক'দিন হল, আমি সে সুখে বঞ্চিত হয়েছি। ভোর পাঁচটা হতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করে ঘরে ফিরে দেখি, ছেলে ঘুমিয়ে আছে। সারা রাত্রিই সে ঘুমিয়ে কাটায়। বাদসাকে এ বিষয় জানিয়েছিলুম, তিনি হেসে বল্লেন,—এ সব মিথ্যা মায়ার খেলা তাজমল! কে কা'র সংসারে? আচ্ছা বেগম সাহেবা! বাদসা সাহেব কি এ সব মায়ার বাঁধ কাটিয়ে ফেলেছেন?"

আমিনা কঠিন উপহাসের সহিত, একটা বিস্ময়সূচকধ্বনি করিয়া, তীব্রকণ্ঠে বলিল "তা নয় তাজমল! খোদ বাদসার সুখের জন্য দুনিয়া খাটছে, মায়া টায়া তাঁ'র কিছু আছে বলে ঠিক জানা যায় নি—তবে তাঁ'র কোন উদ্বেগ অশান্তির কারণ হলে,—তিনি পৃথিবীকে রসাতলে পাঠিয়ে, তবে ক্ষান্ত হন! চিরদিনই ছোটর রক্তে বড় তাজা হচ্ছে, ছোটর দুঃখ কষ্ট, বড়র দেখার নিয়ম আছে বলে, তাঁ'রা মেনে নিতে চান না। ছোটর দুঃখ দেখে বড় যদি এতটুকুন দমে যে'ত, তবে ছোটরা অনেকটা শান্তি পে'তে পারত। প্রজার অভাব অভিযোগ দূর কর্‌বার জন্যই বাদসাকে নিয়োজিত করেছেন—খোদা!--কিন্তু তা'ত হচ্ছে না। তা' হলে কোন দুঃখই থাকৃত না—কা'রো।"

তাজমল হোসেন একটা বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল, "তা—অনেকটা ঠিকই বটে, এ নিয়ে আমার মত গরীবের মাথা ঘামানো একবারে নিষ্প্রয়োজন। আচ্ছা বেগম সাহেবা! এই দু'টি যুবক যুবতীকে এমনি করে কারাগারে পুড়ে, বাদসা সাহেবের কোন্ মতলব সিদ্ধি হ'তে

পারে ? সাহাজাদাকে বিয়ে কত্তে চায় না, তবু জোর করিয়ে মত করালে, এতে দাম্পত্য প্রণয়ের কোন আশা যে থাকতে পারে, এ-ত আমার একেবারেই মনে হয় না। আহা! কি খাসা এদের চেহারা, দেখলে বুক জুড়িয়ে যায়।”

আমিনা অসীম আগ্রহ-মথিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল “এদের তুমি দেখেছ?” তাজমল হোসেন দৃঢ় স্বরে বলিল, “রোজই দু'বার করে দেখছি এদের—কি চেহারা ছিল, চিন্তায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে! কত কি ভাল ভাল আহারীয় দেওয়া হচ্ছে,—সবই প্রায় পড়ে থাকছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে,—খেতে ইচ্ছে হয় না, ক্ষুধা মোটেই নেই! আহা! এত চিন্তায় কি ক্ষুধা থাকতে পারে! দুই পাশাপাশি কক্ষে দু'জনা বাস কচ্ছে, একটা দেয়ালে এদের দুজনার ভিতর অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে। দু'জনাই মিলনের জন্য অসীম আগ্রহে দিন কাটাচ্ছে! আমাকে তা'রা কত অনুরোধ করে,—সাহসে-ত আমার কুলোয় না! সর্ব্বক্ষণ দু'জনা সেই দেয়ালের গায় মুখ রেখে, চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। হায়! খোদা! কেন এদের এমনি করে পুড়িয়ে মারছ? বেগম সাহেবা, এদের অবস্থা যদি দেখতে, তবে চোখের জল রাখতেই পারতে না।”

তাজমল হোসেনের উক্তিতে আমিনার চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। একটা বুকফাটা হাহাকার নীরবে তাহার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। অতিকষ্টে আত্মগোপন করিয়া, ভাবিতে লাগিল,—এ শুভ সুযোগ হাত ছাড়া কত্তে পারা যায় না, প্রহরীকে ভয় দেখিয়ে, কাজ হাসিলের পথ করে নিতে হবে! বাদসার পক্ষ টেনে, সামান্য মোচড় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে! অতঃপর আমিনা প্রকাশ্যে বলিল, “দেখ তাজমল! বাদসার কথার অবাধ্য হওয়াটা যে গুরুতর অপরাধ তা হয়-ত তুমি জান,—এরা অবাধ্য হয়েছে বলেই-ত শাস্তি ভোগ করাতে বাধ্য করেছে। বাদসার কাজে এসব

মন্তব্য প্রকাশ করা, তোমার পক্ষে খুবই দোষনীয়! তুমি-না বাদসার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী!—এসব মন্তব্য তোমার মুখে শোভা পায় না।"

তাজমল হোসেন একেবারে থতমত খাইয়া গেল। তাহার তেজগর্ব্ব স্মিতমুখ অকস্মাৎ দারুণ নৈরাশ্যের মেঘে অন্ধকার হইয়া গেল। একটা অগ্নিগর্ভ তপ্তশ্বাস মোচন করিয়া, অঞ্জলিবদ্ধ করে, কাতর অনুনয়ে কহিল, "বেগম সাহেবা! তা গরীবের কথা ধর্‌বেন না, আমরা মুখ্যু লোক,—কি যে বলে ফেলি মাথামুণ্ডু, তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না, এ বিষয়ে বাদসা সাহেব কোনই অন্যায় করেন-নি।"

আমিনা একগাল হাসিয়া, রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল, "তাজমল! তোমার কথায়, বিদ্রোহীর ভাব যেন প্রকাশ হয়ে পড়েছে—আমি বাদসাকে যদি এ সব কথা বলে দি'—তখন তোমার উপায় কি হবে?"

তাজমল হোসেন, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া আমিনার চরণ-যুগল ধারণ করিয়া, জড়িত কণ্ঠে বলিল "ক্ষমা কত্তে হবে এ নফরকে, গর্দ্দানটা আমার বাঁচিয়ে দিতেই হ'বে আপনাকে, আমার মাথার ঠিক ছিল না,—কি বল্‌তে কি বলে ফেলেছি,—বাদসা সাহেব এর বিন্দু বিসর্গও জান্‌তে পার্‌লে, আমার গর্দ্দান রাখবেন না! আমার মরণ হলে, স্ত্রী-পুত্রের কি উপায় হবে বেগম সাহেবা? দোহাই আপনার, আমাকে এবার মাপ কত্তেই হবে,—প্রাণ থাক্‌তে আমি আপনার অবাধ্য হব না"—বলিয়া তাজমল হোসেন চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

আমিনা তাজমলের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একেবারে মুসড়িয়া পড়িল, শেষে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল "আচ্ছা—এবার ক্ষমা করা গেল,—ভবিষ্যতে এমন কথা আর মুখে এন না।"

তাজমল হোসেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল "আমার একথা বলা ঘাট হয়েছে, আমি আপনার ছেলে, শত অপরাধ করলেও, ছেলে—মা'র নিকট ক্ষমা পেতে পারে।"

আমিনা একগাল হাসিয়া বলিল, যাক্ সে কথা, আচ্ছা তাজমল, এই কারারুদ্ধ যুবক যুবতীকে দেখবার একটা ঔৎসুক্য আমার খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে। তুমি যদি একটুকুন সাহায্য কর, তবে দেখবার সুবিধে হতে পারে। তোমার কি মত?"

তাজমল কয়েক মূহুর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "কারো ভিতরে যাবার হুকুম নেই একেবারে,—বেগম সাহেবা।"

আমিনা দৃঢ় স্বরে বলিল "তাত জানি,—তবু বল্‌ছি তুমি সাহায্য কর্‌লেই হতে পারে, মাত্র পনর মিনিট কাল আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আস্‌ব। কোন বিপদের আশঙ্কা নেই তোমার। কি বল?"

তাজমল ভাবিতে লাগিল,—যদি নিষেধ করি,—তবে আমার উপর খুবই রুষ্ট হবে,—তার ফলে বাদসার কোপ দৃষ্টি আমার ঘাড়ে চেপে বস্‌বে। পনর মিনিটের বিষয়-ত, বাদসার আসবার সম্ভাবনা নেই এখন। অতঃপর জড়িত কণ্ঠে বলিল "আপনার অবাধ্য আমি কখনও হ'তে পারি না, এই দরজার চাবি নিন,—পনর মিনিটের মধ্যেই ফিরে আস্‌লে,—কোন বিপদে নাও পড়তে পারি।"

আমিনা চাবি গুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া—ত্বরিত পদে তোড়নদ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আমিনা সম্মুখের একটা রুদ্ধ গৃহের অর্গল মোচন করিয়া মতিয়াকে দেখিতে পাইল। মতিয়া সেই সময় নত মস্তকে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ আলোক সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইতেই, আমিনাকে দেখিতে পাইল। মতিয়া

উন্মত্ত-অধীরবৎ ত্বরিত গতিতে ছুটিয়া আসিয়া আমিনার গলা জড়াইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অন্তরে যেন আজ কান্নার সপ্ত সমুদ্র তুফান ছুটিয়া চলিল। এক ভীতিপূর্ণ আশঙ্কার হাহাকার যেন তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। হায়! একি বিড়ম্বিত অশান্ত জীবন!

আমিনা অনড় অবস্থায় মতিয়ার গলা ধরিয়া কতক্ষণ কাঁদিল,—শেষে সামান্য প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "বোন! এ-ত কাঁদবার সময় নয়-ই! কাল তোমাদের বিচার হবে, আজ রাত্রির ভিতর যা' হয় একটা কিছু না করতে পারলে, আর রক্ষা নেই,—এখন ধৈর্য্য সহকারে আত্মরক্ষার চেষ্টা কত্তে হবে, অধৈর্য্য হ'লে মুক্তির আশা নেই। তোমাদের রক্ষার জন্যই আমি এতবড় বিপদ সঙ্কুল পথে পা বেড়িয়েছি। আমার প্রাণ বিনিময়ে—তোমাদের রক্ষা কত্তে পারলেও, আমার চেষ্টা সার্থক মনে করব,—আমার এ কাজের পরিণতি যে কি তাহা খোদা বলতে পারেন। আমার সাথে বেড়িয়ে এস,—আমি যা বলব তাই কত্তে হবে।" মতিয়া নীরবে আমিনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

আমিনা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, মতিয়াসহ ভিতরে প্রবেশ করিল। আলোক সম্পাতে দেখিতে পাইল, হোসেন মেঝের উপর, উপুর হইয়া পড়িয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছে। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমিনা অস্থির হইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে হোসেনের হস্তধারণ করিয়া,—সম্মুখে দাঁড় করাইল এবং বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুদ্বয় মুছিয়া দিল। হোসেন আমিনা ও মতিয়াকে সম্মুখে দাঁড়ান দেখিয়া একেবারে কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া গেল। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, চক্ষুদ্বয় দুই হাতে রগড়াইয়া, ফেলিল! ক্রমে মোহ কাটিয়া গেলে, একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে,

আনন্দে তাহার প্রাণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। শেষে আমিনার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল "মা! একি সত্য—তুমি এসেছ?"

সেই "মা" সম্বোধনে আমিনা উন্মাদিনীর মত সকল ভুলিয়া—বাৎসল্য-রসসিক্ত-কম-কণ্ঠে অমৃতধারার ন্যায় ঝরাইয়া দিল—"বাবা!"—পরে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিল। শেষে কোমলকণ্ঠে বলিল "বাবা! ঠিকই এসেছি আমি—তোমাদের সাহায্য কত্তে। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার শক্তিতে যতটুকুন কুলোয়, তা প্রাণ দিয়েও কর্‌ব। সবই খোদার ইচ্ছে, কাল তোমাদের যা কিছু একটা হয়ে যাবে—যা কিছু প্রতিকার আজ রাত্রির ভিতরই কত্তে হবে।—তুমি পুরুষ,—পুরুষের পক্ষে বিপদে ধৈর্য্য হারান উচিত নয়। অসীম শক্তি প্রয়োগ কত্তে চেষ্টা কর—খোদা অবশ্য সহায় হবেন। আমি কয়েক মিনিটের জন্য এসেছি। মতিয়াকে এখানে রেখে যাচ্ছি, দ্বার বন্ধ করে চলে যাব, আবার এক ঘণ্টা পর আমি আস্‌ব। তোমাদের এ রাত্রিতেই এখান হ'তে পালাতে হ'বে। সময় সঙ্কীর্ণ,—আমি এখন যাই।" বলিয়া আমিনা কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল। বাহির হইতে উত্তর কক্ষের দ্বার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া আমিনা চলিয়া গেল।

আমিনা চলিয়া গেলে, হোসেন হর্ষ-বিস্ময়ে ছুটিয়া আসিয়া, মতিয়াকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে মতিয়ার প্রাণের ভিতর এক অসীম উচ্ছ্বাস উদ্দাম বেগে ছুটিতে লাগিল! দুর্ব্বল শরীরে এত আনন্দ-উচ্ছ্বাস তাহার সহ্য হইল না! মতিয়া একরূপ মূর্চ্ছিতা হইয়াই হোসেনের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার চৈতন্যের উন্মেষ হইল। মতিয়া হোসেনের

গলা জড়াইয়া, অনিমেষ নেত্রে হোসেনের মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। তাহার মুখমণ্ডল আনন্দের জ্যোতিঃতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। তাহার একান্ত ঈপ্সিতের অতুলা-সুন্দর মুখের দিকে আহত নেত্রে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল! তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া এক আর্ত্তধ্বনি, আপনাকে ফাটাইয়া দিবার জন্য, তাহার ভিতরটাকে নির্দ্দয়ভাবে, পীড়ন করিতে লাগিল। মতিয়ার মন প্রাণ এক মুহূর্ত্তে যেন, গুরু গুরু মেঘ ডম্বর রোলে, উৎকণ্ঠিতা ঊর্দ্ধনেত্রী চাতকীর মত, গভীর তৃষ্ণায়, বিমানের পানে উন্মত্ত-আগ্রহে,—উৎপ্রেক্ষিত হইয়া উঠিল। আশা-নিরাশার বিপুল সংঘাত, তাহার বুকের মধ্যে চকিত বিজলীর সঘন স্ফুরণের মতই, মুহুমুর্হুঃ স্ফুরিত হইতে লাগিল।

হোসেন অতি কষ্টে আত্মস্থ হইয়া দেখিল—দুইখানা কোমল মৃণাল বাহু তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আর দুইটি সজল নীলোৎপল নয়ন হইতে অসীম-স্নেহ-করুণার অমৃতধারা ঝর্‌ঝর্ ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রুদ্ধ অশ্রুর জমাট-বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া লইল। কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে কাটাইয়া দিয়া, উভয়েই অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। হোসেন—মতিয়ার মুখখানা আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া—ডাকিল 'মতিয়া'!"

মতিয়া আত্মহারা হইয়া প্রত্যুত্তর করিল "কি প্রিয়তম!"

আবার কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া হোসেন বলিল "এখন কি করা যায়? কিছুই যে ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।"

মতিয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিল "এ যে ভয়ানক সমস্যা! বিবাহের সপক্ষে মত দিলে, তোমাকে পাবার আশা আর-ত থাক্‌বে না! এক আত্মহত্যা ছাড়া,—আমার মুক্তি নেই!• যদি অমত

প্রকাশ করি তবে আমার চক্ষের উপর, তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করবে,—কি ভয়ানক সঙ্কল্প! তোমার রক্তে মৃত্তিকা ভেসে যাবে, আর আমি তা স্বচক্ষে দেখে, বেঁচে থাক্‌ব ? হায়! বিধাত! কি সমস্যায় আমাকে এনে দাঁড় করালে!" বলিয়া মতিয়া হোসেনের বুকে মস্তক রাখিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হোসেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, জড়িতকণ্ঠে বলিল—"ছি,—কেঁদ না, কাঁদবার-ত অনেক সময় রয়েছে,—কাঁদাই যে আমাদের একমাত্র সম্বল! মতিয়া! আমি গরীব, সামান্য প্রজা বৈ-ত নই,—আমাকে লাভ করার জন্য কেন তুমি, এমনিভাবে, আপনাকে অসীম অশান্তির ভিতর টেনে নিয়েছ ? তোমাকে আমি পাই, সে কপাল নিয়ে আমি জন্মাই-নি! বেগম হবার প্রলোভন-ত কম নয়,—কেন তুমি সামান্য একটা স্মৃতির অনল বুকে করে, সে ঐশ্বর্য্য, সম্পদ পদদলিত কত্তে চাইছ! আমার মত ক্ষুদ্র প্রজা, বাদসার বিদ্রোহী সেজে, ক'দিন টিক্‌তে পার্‌ব ? তোমাকে সুখী হতে দেখলে, আমার খুবই আনন্দ হবে। তুমি বিবাহে মত দিয়ে, জীবনের ধারা ফিরিয়ে নাও,—এতেই আমি সুখী হব।"

মতিয়া হোসেনের প্রতি নির্নিমেষে তাকাইয়া বলিল—"যে দিন তোমার সাথে প্রথম দেখা হল, সেই মধ্যাহ্নের শুভ্র সুন্দর স্মৃতিটুকুন কোনদিনই মুছে ফেল্‌তে পার্‌ব না। তারপর যৌবন-পদ্মের কোরকের উপর সেই শান্ত-স্নিগ্ধ রশ্মিপাত,—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মুদিত কোরকগুলি কেমন করে যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার স্মৃতি মনে পড়লে, রক্তের তালে তালে, নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনে, প্রাণের ভিতর এক অভিনব সাড়া এনে দেয়, তা'ত মুছে ফেলা চলে না! যে জিনিষ শব্দ গর্জ্জনে আপনাকে প্রকাশ করে, তা' সুধু সকলকে সাবধান ক'রে

দেয়! সুধু—মাত্র রেখাপাতে, অন্তরের শিরায় উপশিরায়, সুকুমার হিল্লোলে, যে মৃদু কম্পন জাগিয়ে তোলে, সেটাই বুকে অধিক দাগ বসিয়ে যায়! প্রেম বল, ভালবাসা বল, এমন একটা কিছু, আকাঙ্ক্ষার শত-ধারায় মথিত হয়ে যখন অন্তরে জেগে উঠেছে, তখন তা'কে কৌস্তভ-মণির নয়ন ভোলান আলোর মতই আঁকড়ে ধরে থাক্‌ব, এ অধিকার সহজে-ত ছাড়া যাবে না। ভালবাসা তুচ্ছ নহে! সেও সাধনা, অশ্রুজল সাপেক্ষ, তা'তে নিষ্ঠুরতার আঘাত নেই, কিন্তু বজ্রের কঠোরতা রয়েছে! স্মৃতির অনল তুমি সামান্য বলে উড়িয়ে দিতে চাইছ? তুমি যদি আমার অন্তরের ভিতরকার সন্ধান নিতে পার্‌তে,—তবে দেখ্‌তে. কত বড় একটা পবিত্র তন্ময়ত্বে আমার অন্তর অধিকৃত হয়ে আছে! তার নিকট সুখ-ঐশ্বর্য্যের মোহময় প্রলোভন, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ! অমত প্রকাশ কর্‌লে তোমার জীবন নষ্ট হবে, সেই একমাত্র আশঙ্কায় অস্থির হয়ে পড়েছি। যদি তোমাকে রক্ষা কত্তে পাত্তুম, তবে দেখিয়ে দিতুম, ভালবাসার তন্ময়ত্বের নিকট, মৃত্যুর দংশন-ভীতি, কত সামান্য,—কত তুচ্ছ! যে দিন এ ভবের সুতো কাটার পালা শেষ হয়ে যাবে, সে দিন যেন পরপারে যাত্রার জন্য বিন্দু-দ্বিধার সঞ্চারও না হয়, এই আশীর্ব্বাদই তুমি—।"

কথা শেষ না হইতেই মতিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদের কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া স্বয়ং বাদসা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সক্রোধ কটাক্ষে, ভ্রূকুটি-বদ্ধ আরক্ত-মুখে, একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন শত তীব্র জ্যোতিঃতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল! সেই দীপ্তি যেন তাহাদের উভয়কে দগ্ধ করিয়া, পোড়াইবার জন্য শিখা বিস্তার করিতেছিল!

আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তের ন্যায়, উভয়ে চমকিয়া উঠিল। উভয়ের মুখে ভূতাহতের মত আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মতিয়া

আলুথালু বেশে ছুটিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। হোসেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায়, নত মস্তকে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। উভয়ের দেহই একটা আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হোসেন আলী ও মতিয়াকে কারারুদ্ধ করিবার পর হইতে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের ন্যায়, বাদসা সাহেব, প্রতিদিনই একবার করিয়া উভয়ের কারাকক্ষে প্রবেশ করিতেন এবং তাহাদের তত্ত্বতালাস করিবার ছলে, কৌশলে উভয়ের অন্তরের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া আসিতেন। কক্ষদ্বয় পরিদর্শনের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না,—কাজেই প্রহরিগণ সর্ব্বক্ষণই বাদসার আগমন প্রতীক্ষায় শশব্যস্ত থাকিত। সদালাপ ও সদ্ব্যবহারদ্বারা বাদসা সাহেব সর্ব্বদাই, তাহাদের ভীষণ অবরোধ-ক্লেশের অনেকটা প্রশমতা সম্পাদন করাইতে সচেষ্ট থাকিতেন।

বাদসা সাহেব অনেক সময়, কথা প্রসঙ্গে, মতিয়াকে বুঝাইয়া দিতেন,—সাহাজাদার সহিত তাহার উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইবার ক্ষমতা জগতে আর কাহারও নাই। সুতরাং হোসেন আলীর সহিত তাহার বিবাহের চেষ্টা ও তৎপরতা কোন দিনই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। অনেক সুকৃতির ফলে, কাহারও ভাগ্যে বাদসার পুত্রবধূ হইবার সৌভাগ্য ঘটে। বাদসার পুত্রবধূই সময়ে বেগমের আসন অধিকার করিয়া থাকে;—তাহার

প্রতিপত্তি, ভোগৈশ্বর্য্য, সুখ, সম্পদ এতটা লোভনীয় যে, স্ত্রীলোক মাত্রই উহা বরণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এত বড় সৌভাগ্য-সুযোগ করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও, স্বইচ্ছায় পদদলিত করার মত ছেলেমানুষী আর কিছুই হইতে পারে না।—বাদসার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, অশান্তির অবসান-ত হইবেই না, অধিকন্তু জীবন নাশের আশঙ্কাও রহিয়াছে!—মতিয়া সমস্ত কথা নীরবে শ্রবণ করিত এবং বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত!

সেদিন ভোর নয়টায় বাদসা সাহেব কারাকক্ষ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া, বিকাল বেলাও আবার হোসেন আলীর কারাকক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলেন। কক্ষের ভিতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই দেখিলেন, হোসেন ও মতিয়া একত্র উপবেশন করিয়া, অপলক-দৃষ্টিতে বাক্যালাপ করিতেছে! সেই অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, বাদসা সাহেব একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন, অকস্মাৎ, অগ্নিতপ্ত সলিলবৎ, আলোড়ন জাগাইয়া, মস্তক অধিকার করিয়া বসিল। রাগে, ক্ষোভে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বাক্‌শক্তি হারা হইয়া তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন;—এত বড় অসম্ভব ব্যাপার তাঁহার প্রাসাদের সীমানার ভিতর যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও ধারণা করিতে পারেন নাই! তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া, এমন দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, এমন লোক তাহার রাজ্যের ভিতর থাকিতে পারে, তাহা তিনি অনুধাবনা করিতে পারিলেন না। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া শ্লেষ-প্রচ্ছাদিত-কণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া! ঠিক করে বল,—কে তোমাকে এ কক্ষে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে?—বল,—এই মুহূর্ত্তেই তা'র মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে, প্রতিদ্বন্দ্বীতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান

কচ্ছি। একি? চুপ করে রইলে যে,—এতে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই—মতিয়া!—তার নাম প্রকাশ কর্‌বে না?"

মতিয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নীরবে মস্তক হেঁট করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। কোনই প্রত্যুত্তর করিল না।

বাদসা সাহেব পাঁচ মিনিটকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন পুনরায় হোসেন আলীকে প্রশ্ন করিলেন। হোসেন আলীকেও নীরবে থাকিতে দেখিয়া,—তিনি একেবারে অস্থির হইয়া গেলেন। শেষে দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক-স্বরে মতিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বল্‌বে না? বেশ,—আমি এখনই সমস্ত কথা বের করে নিচ্ছি, এ কক্ষ হ'তে তুমি এই মুহূর্ত্তেই বের্ হয়ে এস,—অপরাধীর বিচার, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই শেষ করে,—তবে ছাড়্‌ব।"

মতিয়া আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাদসা সাহেব—হোসেনের কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মতিয়ার কক্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিয়াও বাদসার আদেশে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল! বাদসা সাহেব তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া! মনে রেখো, তোমাদের, যে পনর দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল, তা' আজ শেষ হইয়া গেল, কাল তোমাদের বিচার শেষ করে, একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেল্‌ব। রাত্রির ভিতর তোমার মতামত ঠিক করে রেখো।—আমার আদেশ তোমাকে আবার শুনিয়ে দিচ্ছি। আমার পুত্রবধূ হ'তে যদি তুমি স্বইচ্ছায় স্বীকৃত না হও, তবে তোমার চোখের সম্মুখে, হোসেনের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে, তোমার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষার--সূত্র, একেবারে ছিন্ন করে দোব! এরপর তোমাকে আরও পনর দিন কারারুদ্ধ করে রাখ্‌ব! পনর দিন অন্তেও যদি তোমার মতের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তোমাকে

জীবন্ত কবর দিয়ে,—এ অভিনয়ের যবনিকা টেনে দোব। বুঝলে? আর যদি স্বইচ্ছায়, পুত্রবধূ হতে স্বীকৃত হও—তবে তোমাদের দুজনার বিয়ে দিয়ে,—দৌলতের সহিত হোসেনের বিয়ে দিয়ে দোব। এই আমার সঙ্কল্প,—এর ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘট্‌তে দোব না।" বলিয়া বাদসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাদসা সাহেব, কারারক্ষক তাজমল হোসেনের সম্মুখীন হইয়া ক্রোধব্যঞ্জক তীব্রকণ্ঠে ডাকিলেন—"তাজমল!"

তাজমল নতজানু হইয়া, বাদসাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইয়া, উত্তর করিল—"জনাব! খোদাবন্দ!"

বাদসা সাহেব উত্তাপতপ্ত অঙ্গার খণ্ডের মতই, আরক্ত মুখে, তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "তাজমল! তোমাকে একজন বিশ্বস্ত প্রহরী বলেই এতদিন জান্‌তুম। তুমি এত বড় বিশ্বাসঘাতক, তা'ত ধারণা কত্তে পারি-নি!"

তাজমল সসম্ভ্রমে উত্তর করিল "খোদাবন্দ! এ নফর চিরদিনই আপনার বিশ্বস্ত ছিল, এখনও তা'ই আছে, বিশ্বাসঘাতকের কোন কাজ সে কখনও করে-নি, আজও করেছে বলে, জ্ঞানত তা'র মনে হয় না।"

বাদসা সাহেব গভীর গর্জ্জনে বলিলেন "তুমি ঘোর অবিশ্বাসী ও মিথ্যাবাদী! হোসেন ও মতিয়াকে এক কক্ষে বাস কত্তে কে সাহায্য করেছে? বল,—ঠিক করে বল, এ কাজে তুমি সহায়তা করেছ কি না?"

তাজমল হোসেন বাদসা সাহেবের অভিযোগ উক্তি শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিল। এক অভাবনীয় বিপদের আশঙ্কায় তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে বদন মণ্ডলে একটা ভীতি বিপন্নভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে একান্ত বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেগম সাহেবাই এই অনুষ্ঠানের নায়িকা বলে মনে হয়,—এখন উপায় কি? বেগম সাহেবার নাম প্রকাশ না কর্‌লে—তা'র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন

হইবেই! আর বেগম সাহেবাকে এর ভিতর জড়িত কর্‌লে, উভয়কেই একই প্রকার শাস্তি ভোগ কত্তে হবে। মেয়ে মানুষের প্রাণ সহজেই গলে যায় কি না, তাই পরিণাম চিন্তা না করেই তিনি এম্‌নি কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁর-ত দোষ নেই এতে,—মানুষ মাত্রই, তা'দের অবস্থা দেখে, এমন একটা কিছু না করে থাকতে পারে না। যাক্,—আমার মৃত্যু যখন অনিবার্য্য, তখন তাঁকে জড়িত হতে দোব না। জীবনে-ত কখনও মাকে দেখবার সুবিধে ঘটে-নি, শৈশবেই যে মাতৃহীন হয়েছিলুম! তাঁকে আমি 'মা' বলে ডেকেছি,– না– 'মার' নাম আমি বেঁচে থাক্‌তেও প্রকাশ হ'তে দোব না!

বাদসা সাহেব তাজমলকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া, শ্লেষ-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিলেন "চুপ করে রইলে যে? বল,—এ কাজ তবে তুমিই করেছ।"

তাজমল নিতান্ত বিনম্র ও বিষাদিত-কণ্ঠে উত্তর করিল—"না, এ কাজ আমি করি-নি।"

বাদসা সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন "কারাগারে প্রবেশ করে, এ কাজ তবে কে করেছে? তার নাম বল,—তার উপযুক্ত শাস্তির বিধান কচ্ছি।"

তাজমল নতশিরে, করজোড়ে বলিল "বাদসা সাহেব! তাঁর নাম আমি এখন প্রকাশ কত্তে অনিচ্ছুক।"

বাদসা সাহেব গভীর গর্জ্জনে, অনুযোগপূর্ণ স্বরে বলিলেন "তাজমল! তুমি এত বড় বিশ্বাসঘাতক? এর শাস্তি কি হ'তে পারে তা' তুমি—জান?"

ভীত, ত্রস্ত, অর্দ্ধমৃতবৎ তাজমল, কম্পিত বক্ষকে অধিক কম্পিত করিয়া উত্তর করিল "তা অনেকটা জানি। আমি বিশ্বাসঘাতক নই,

ভগবানের চক্ষে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কোন কারণে তাঁর নাম প্রকাশ কত্তে আমি অনিচ্ছুক।"

বাদসা সাহেব অসীম তেজের সহিত বলিলেন "এত বড় সাহস তোমার! বাদসার আদেশ অমান্য কত্তে তুমি এতটুকুন কুণ্ঠাবোধ কর-নি! আচ্ছা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও! এখনি ঘাতক ডেকে তোমার দাম্ভিকতার প্রতিফল দিচ্ছি।" বলিয়া বাদসা সাহেব সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

দুপুর বেলাকার জ্বলন্ত তপন, তখন শীতল হইয়া, পশ্চিমের নাল সাগরে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ ডুবাইয়া দিয়াছিল। ধরণীর ম্লান মুখের পানে তখনও তাঁহার ক্লান্ত করুণ শেষ দৃষ্টিটুকুন লাগিয়াই রহিয়াছিল। সেই সময় আমিনা কিয়দ্দূরে, প্রাচীরের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া, তাঁহাদের সমস্ত কথাই শ্রবণ করিল। বাদসাকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সহসা আমিনা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ডাকিল—"বাদসা সাহেব!"

সহসা পথিমধ্যে আমিনার আহ্বান শ্রবণ করিয়া, বাদসা সাহেব তাঁ'র চলন্তগতি সংহত করিলেন এবং আমিনার মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন "এ সময় তুমি এখানে কেন দাঁড়িয়ে,—আমিনা!"

আমিনা নম্রকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! বিশেষ জরুরী কাজেই আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কচ্ছি। আমার এ আহ্বান উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না।"

বাদসা সাহেব বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বলিলেন "আমিনা! আমি এখন খুবই ব্যস্ত,—তোমার অনুরোধ পরে রক্ষা করব। তুমি তোমার কক্ষে ফিরে যাও, আমি এক ঘণ্টা পরে যাব,—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

আমিনা জড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! আমি এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সব কথা শুনেছি। আপনি যে কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য এত

ব্যস্ত হয়েছেন, তা' কয়েক মিনিট পরেও সমাধা করলে, কোন ক্ষতির কারণ নেই। আমার কয়েকটি কথা আপনাকে শুনতেই হবে, এ অনুরোধ রক্ষা করবেন না,—বাদসা সাহেব ?"

বাদসা সাহেব আমিনার দিব্যরূপিণী, প্রশান্ত ধীর মূর্ত্তির প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন "বল—আমিনা! তোমার কি বক্তব্য,—আমার সময় যে খুবই কম, তুমি-ত ছাড়বে না,—বল কি বলবে।"

আমিনা তেজব্যঞ্জকস্বরে বলিল "বাদসা সাহেব! আমি যা বলব তা খুবই গোপনীয় কথা,—আমার শয়নকক্ষে আপনাকে যেতেই হবে,—যা' বলব মনে করেছি,—তা প্রকাশ করবার স্থান এ নয়-ই।"

বাদসা সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া বলিলেন "আচ্ছা আমিনা! চল তোমার শয়নকক্ষে। তোমার কি গোপনীয় কথা থাকতে পারে, তা'ত ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না!"

আমিনা পর মুহূর্ত্তে বাদসাকে সঙ্গে করিয়া তাহার শয়নকক্ষে যাইয়া উপনীত হইল। বাদসাকে একখানা আরাম কেদারায় বসাইয়া, স্বয়ং একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল,—শেষে জড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! তাজমল হোসেন নিতান্ত নিরপরাধী। তা'র উপর এত বড় শাস্তির বিধান করলে,—আপনার মঙ্গল হবে না,—আপনার মঙ্গল অমঙ্গলের সহিত যখন আমার শুভাশুভ নির্ভর করে, এ অবস্থায় আপনাকে এ কার্য্য হ'তে বিরত করাতে চাচ্ছি।"

বাদসা সাহেব বিস্ময়সূচক দৃষ্টি আমিনার মুখের উপর সংন্যস্ত করিয়া বলিলেন "কিসে জানলে তুমি, সে নির্দ্দোষী? অপরাধীর নাম প্রকাশ না করাও-ত একটা গুরুতর অপরাধ।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আমিনা নিতান্ত সহজভাবে বলিল "অপরাধীর নাম প্রকাশ না করে সে তা'র মহত্ত্ব শতগুণ বিকাশ করেছে,--নিজের প্রাণ দিয়ে যে অপরকে রক্ষা কর্‌তে চায়,—তার স্থান মর্ত্তে নয়-ই। তাজমল একজন সামান্য চাকর, তা'র অন্তরের বল উপলব্ধি করে, আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গেছি। আমি ঠিক জানি, সে অপরাধী নয়, এ কার্য্যে সে অপরাধী নয়, এ কার্য্যে সে সহায়তাও করে-নি, এর বিন্দুবিসর্গও সে জানে না! আপনার আদেশ প্রতিপালন করেছে মাত্র।"

বাদসা সাহেব সংশয়-মথিত-দৃষ্টিতে আমিনার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "আমার আদেশ প্রতিপালন করেছে? সে কি বল্‌ছ? আমি-ত অপর কাউকেও কারাকক্ষের সীমানার ভিতর প্রবেশ করাতে অনুমতি দেই-নি! এদের আমি গোপনে কারারুদ্ধ করে রেখেছি,-- বাহিরের লোক কেউ এর ঘুণাক্ষরও জান্‌তে পারে-নি।"

আমিনা নিতান্ত সহজভাবে, জড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! আপনি ভুল কচ্ছেন। আমাকে সর্ব্বত্র বিচরণের আদেশ আপনিই প্রদান করেছেন। এ মর্ম্মে সকলের নিকট আপনি হুকুমও প্রচার করেছেন। এ কার্য্যের আমি-ই নায়িকা। আপনার আদেশ প্রতিপালন করেছে বলেই, আমি কারাকক্ষের প্রবেশ পথ মুক্ত পেয়েছিলুম; তাজমল এতে কিসে দোষী বাদসা সাহেব? আমিই ভিতরে প্রবেশ করে, এদের এক কক্ষে রেখে দিয়েছিলুম, দোষী আমি,—তাজমল নয়! আমার অনিষ্ট হবে বলেই তাজমল আমার নাম প্রকাশ করে-নি,— দেখুন এখন বাদসা সাহেব! তাজমলের অন্তর কত বড়,—কত উঁচু।"

আমিনার স্বীকার উক্তিতে বাদসা সাহেব বিস্ময়াশ্চর্য্যপূর্ণ-দৃষ্টিতে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিস্ময়াভিভূতবৎ 'কয়েক মুহূর্ত্ত

বাদসা সাহেব তিরস্কারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমিনা! আমার ভোগ ও তৃপ্তির সামগ্রী সংগ্রহ করার পূর্ণ শক্তি আমার রয়েছে, এর বিরুদ্ধে বাধা দিবার শক্তি কা'রো নে-ই বলেই,—রাজ্যের সকলেই মস্তক অবনত করে, আমার আদেশ পালন করে থাকে। মতিয়াকে যখন পুত্রবধূ কর্‌বার বাসনা জাগরিত হয়েছে, তখন তোমার ঐ বক্তৃতার সূক্ষ্মতন্ত্রী ধরে আমি কখনও আপনাকে পরিচালিত কত্তে পার্‌ব না। যতটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার মনে হয়,—এদের বিবাহ ব্যাপারে তুমি আমার সহায় না হয়ে, হয়-ত নানা বাধার সৃষ্টি কর্‌বে! এ অবস্থায় তোমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাক্‌লে, এ বিবাহ অনুষ্ঠানের পক্ষে তুমি পাহাড়-প্রমাণ প্রতিবন্ধক এনে দাঁড় করাবে! আজ হ'তে তুমি বন্দী,—এ কক্ষেই তোমাকে বন্দী হয়ে থাক্‌তে হবে! এদিকের সমস্ত গোলযোগ থেমে গেলে, তোমার মুক্তি হবে! পরে আমার ইচ্ছা হলে, তোমাকে বেগমরূপে গ্রহণ কত্তে পারি,—সে বিষয়ে তোমার মতামতের উপর নির্ভর করে চলার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

আমিনা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল "আমি বন্দী? তা'তে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই, তবে বাদসা সাহেব! এটা বিশেষ করে জেনে রাখ্‌বেন,—ভালবাসার রাজ্য স্নেহের-বন্ধনেই সুগ্রথিত,—অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সে রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায় না! জোর করে বেগম করে নেওয়ার ফলে,—প্রেমের অমৃতময় পীযূষধারা পান কর্‌বার সুবিধা কোন দিন-ই কারো ভাগ্যে ঘটে উঠে না।"

বাদসা সাহেব তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেন "বাদসার নিকট সে সমস্তও অনায়াস-লব্ধ বলে মনে হচ্ছে।" বলিয়া বাদসা সাহেব সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পর মুহূর্ত্তে বাদসার আদেশে, আমিনাকে সেই কক্ষেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন ভোর ছয়টায়, প্রাসাদের সংলগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত, অপ্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণে, বাদসা সাহেব, বিচার-সভা আহ্বান করিলেন।

সেই দিন ভোর হইতেই, আকাশপট, ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সূর্য্যের জ্বালাময় প্রচণ্ড লীলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মেঘের কালো অলক দান, দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়া একটা প্রলয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।

বাদসা সাহেব বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। পার্শ্বে জনকয়েক, বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গ, উৎকণ্ঠা-চাঞ্চল্যে উপবেশন করিয়া,—দুইটি তরুণ-তরুণীর, অভাবনীয় পরিণাম ফল চিন্তা করিতে লাগিল।

বাদসার দক্ষিণ পার্শ্বে,—"ঘাতক"—সুতীক্ষ্ণ তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান! প্রায় কুড়ি বছর যাবত সে ঘাতকের কাজই করিয়া আসিতেছে! বাদসার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যাইয়া, সে কতশত মানবের শির ছিন্ন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! শত শত মৃত্যু-চিন্তা-বিক্ষুব্ধ নর-নারীর ভয়ার্ত্ত করুণ-দৃষ্টি অবলোকন করিয়া, তাহাদের তাজা রক্তে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া,—তাহার নৃশংস অন্তরে সামান্য অণুকম্পার

ভাবও ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই! তাহার স্থির, শান্ত মুখখানি উল্লসিত করিয়া, দাসানুদাসের মতই গর্ব্ব-স্ফীত-বক্ষে, বাদসার হুকুম তামিল করিয়া আসিতেছিল! বাদসার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই তরবারির উত্থান ও পতন! পরক্ষণে রক্তপ্রবাহের অনন্ত প্লাবন! কার্য্যশেষে, সে প্রলয়াগ্নির মতই চণ্ডহাস্য করিয়া বধ্যভূমি পরিত্যাগ করিত! বিকট পূঁতিগন্ধময় মশান ক্ষেত্রে, তাহার তরবারি যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, সকলকে জানাইয়া দিতেছিল,—শক্তিমন্ত স্বাধীনচেতার খামখেয়ালির উপর, চিরদিনই জগৎ স্রোত ভেসে চলেছে, এম্‌নি করে চিরদিনই ভেসে চল্‌বে! অধীনতার পরিপূর্ণ ভোগ, এমনি করে রক্ত-প্লাবনের ভিতর দিয়েই, বিলয়-অগ্নির ইন্ধন যোগাতে থাক্‌বে।

বাদসার আদেশে, হোসেন ও মতিয়াকে আনিয়া, বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড় করান হইল! মতিয়া—মলিন—দীনাতিদীনা ভিখারিণীর মতই, অনন্যসহায়, বিষণ্ণ মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! আপনাকে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে, বিদ্ধ-বক্ষ বিহঙ্গীর মতই, গুমরিয়া গুমরিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার সমস্ত দেহ ঘন ঘন কম্পনে প্রসারিত হইতে লাগিল। তাহার ললাট ও কর্ণমূল গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া যেন তাহাকে অগ্নি-দাহ জ্বালায় জ্বালাইয়া তুলিল।

হোসেন আলী যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের প্রাণহীন শবের মতই নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল,—যেন সুষুপ্ত অন্ধকারের কৃষ্ণ আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া, একটা মৃত্যু-শীতল নিস্পন্দ দেহ, কোনরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! মনে হইতেছিল, যেন একটা প্রবল বিতৃষ্ণায়, তাহার অসহায়-শুষ্ক-শ্রান্ত-মলিন মুখখানা, প্রদোষকালের সমস্ত বিষাদছায়া লইয়াই ফুটিয়া রহিয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুগভীর ঘৃণাভরে উহাদিগের প্রতি নিমেষের কটাক্ষমাত্র নিক্ষেপ করিয়া, বাদসা সাহেব,—পারিপার্শ্বিক অমাত্যবর্গের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পর মুহূর্ত্তে মতিয়ার প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া শ্লেষপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন "মতিয়া! তুমি আমার পুত্রবধূ হ'তে স্বীকৃত আছ? এ লোকজন সমক্ষে আত্মমত প্রকাশ করে, আমার বিচারকার্য্য শেষ কর্ত্তে সহায়তা কর। তবে মনে রেখো, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি,—তোমার স্বীকার উক্তি ছাড়া, জোর করে আমি এ উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হ'তে দোব না! আমাদের ধর্ম্মেও সেরূপ কার্য্য নিষিদ্ধ।"

প্রশ্ন শুনিয়া, মতিয়ার মনে হইল,—মাথার উপরের সুনীল আকাশার্দ্ধ যেন, ভাঙ্গা বাড়ীর ছাদের মতই মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল! সে যেন তাহারই রুদ্ধ চাপে, আহত রুদ্ধ-শ্বাস হইয়া রহিয়াছে! তাহার চিন্তা, ধারণা, সহসা যেন রুদ্ধ-স্রোত নদী-সলিলের মতই, ধীর, স্থির,—তাহার জীবনীশক্তি-সঞ্চারক রক্তের স্রোত যেন, বদ্ধ ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে! মতিয়ার ভূমি-ন্যস্ত দৃষ্টি আরক্ততর হইল! বহুক্ষণ সে, সেই একইভাবে স্তব্ধ অসাড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল! তাহার পর যেন প্রাণপণ বলে রুদ্ধ-শ্বাসকে, কোনমতে টানিয়া লইয়া, অবশ, অসাড় জিহ্বাকে স্ববশে আনিয়া ক্ষোভ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব!—ঘাতক দিয়ে আমার জীবন নাশ করুন, আমি স্বইচ্ছায় মস্তক পেতে দিচ্ছি! অনেক চেষ্টা করেও যে আমি মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারি-নি! আমার মতের উপর নির্ভর করে,—এম্নি করে একজন নিরপরাধীর জীবন নাশ কর্‌বেন? আমি আপনার পুত্রবধূ…। আর বলিতে পারিল না। একটা অসীম অবসাদের তাড়নায়, মতিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া—ভূতলে পড়িয়া গেল!

কয়েক মুহূর্ত্ত জল সিঞ্চনের পর, মতিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। বাদসা সাহেব নিতান্ত বিস্ময়াহতভাবে,—নির্ম্মমের মতই ক্রোধ বিরসকণ্ঠে বলিলেন "তোমার এম্‌নি ধারা উত্তর শুন্‌তে আমি একেবারেই ইচ্ছে করি না। তুমি স্বীকৃত কি না তা'ই স্পষ্ট করে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত কর; আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় দিচ্ছি, এরই মধ্যে তোমার মতামত জানাতে হ'বে। তবে মনে রেখো,—হোসেন আলীর জীবন-মরণ তোমার চূড়ান্ত মীমাংসার উপর নির্ভর কচ্ছে!"

উক্তি শ্রবণ করিয়া মতিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ যেন তাহার নিকট, একাকার হইয়া গেল! জীবনের অসীম ব্যর্থতার ভীষণ নগ্নতা যেন, আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া, তাহার অন্তরকে খান খান করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল! রুদ্ধ বাষ্প চাপে, ভূগর্ভের মতই বিদীর্ণ হইতে চাহিতে লাগিল, ছিঁড়েও না অথচ ফাটেও না, এম্‌নি ধারা উৎকট যন্ত্রণার সহনাতীত তাপে সে দগ্ধ হইতে লাগিল! একটা নবোদ্ভূত রোষে ও ক্ষোভে তাহার হৃদয়, প্রাণ, যেন ভীষণতর বিদ্রোহ হইয়া উঠিল! মতিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল! বাদসা সাহেব গভীর গর্জ্জনে বলিলেন "কোন মত প্রকাশ কর্‌বে না তুমি? এতটুকুন বালিকার নিকট বাদসার ক্ষমতা, অক্ষমতায় পরিণত হবে? না—,তা'ত হ'তে দোব না! যা' সঙ্কল্প তা' কার্য্যে পরিণত কর্‌বই, সামান্য মায়ার সংঘাতে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাতে দোব না।" অতঃপর বাদসা সাহেব হোসেন আলীর প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিলেন "হোসেন! তুমি মৃত্যুর জন্যই এ মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হও,—ঘাতকের ঐ সুতীক্ষ্ণ তরবারির

আঘাতে, তোমাকে জীবন-লীলা শেষ কত্তে হবে,—ইহাই বাদসার আদেশ।" বাদসা সাহেব পর মুহূর্ত্তে ঘাতকের প্রতি তাকাইয়া,—বলিলেন "ঘাতক! হুকুম তামিল কত্তে প্রস্তুত হও,—আমার অঙ্গুলি সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই,—তোমার কার্য্য সমাধা কত্তে হ'বে।"

বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া হোসেনের প্রশান্ত ললাট মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত শ্রীমণ্ডিত দেখাইল। আবার পর মুহূর্ত্তে সেই আনন্দ জ্যোতিঃকে, করাল-দুশ্চিন্তা-মেঘ-কবলে যেন ম্লান করিয়া দিল! একটা গুরু ভারাতুর, অথচ অনুপায় হেতু ক্ষোভে জর্জ্জরিত, হৃদয় মন লইয়া হোসেন ক্রুদ্ধ ও ক্রুরকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! মতিয়া তা'র মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে, যা' করা কর্ত্তব্য তা'র সবটুকুনই জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করেছে! তা'র অন্তরের ভিতর অসীম স্নিগ্ধ স্বর্গের মিলন পূণ্যজ্যোতিঃ যে বিরাজমান ছিল, তা' এতদিন বুঝে উঠ্‌তে পারি-নি! মতিয়াকে খোদা এম্‌নি উপাদানে তৈয়ার করেছেন, যা'র উন্মাদনা-শক্তিকে প্রলুব্ধ করাতে, বাদসার অতুলনীয় সম্পদাভরণ নিতান্তই হীন ও অপ্রতুল! মতিয়ার মত রমণীকে জীবন-সঙ্গিনী কর্‌তে গিয়ে, এভাবে মৃত্যুকে বরণ করাও শ্লাঘনীয়! মৃত্যু—সে-ত জীবনের শেষ পরিণাম! সকলকেই একদিন বরণ কত্তে হবে! এর জন্য ভীত শঙ্কিত হয়ে, অপরকে কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট কর্‌বার মত কামনা চিরদিনই বর্জ্জনীয়! তবে বাদসা সাহেব! অন্তরে অনেক কথা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে—তা' ব্যক্ত কর্‌বার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিতে হ'বে। এ আবেদনও কি মঞ্জুর কর্‌বেন না বাদসা সাহেব?"

ভীষণ ঝটিকার সময়, উন্মত্ত-নদীর তরঙ্গগুলি শ্বেতফেণা উদ্গীরণ করিয়া, সর্ব্বনাশী হাসির মতই, মুখব্যাদান করিয়া, যেমন ঘোর আবর্ত্তে পতিত, ভয়ার্ত্ত আরোহীবর্গের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদকে ডুবাইয়া

দিয়া; ক্ষুদ্র তরণীকে উন্মত্ত অধীরে অবলোকন করে,—বাদসা সাহেব তেম্‌নি জ্বালাময় অট্টহাসি হাসিয়া, অপ্রসন্ন ভ্রূভঙ্গীর সহিত বলিলেন "তোমার আবেদন মঞ্জুর করা গেল,—তবে বাদসার সম্মুখে সংযত ভাষায় যা' বল্‌তে হয় বল্‌বে,—যদি রূঢ়বাক্যে কোন অবমাননা কত্তে চেষ্টা কর, তবে মনে রেখো, তোমার খুবই অকল্যাণ ঘট্‌বে,—বুঝ্‌লে ?"

বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া—হোসেন ধৈর্য্যের বাঁধ হারাইয়া ফেলিল। একেবারে উন্মত্ত অধীরের ন্যায়, তীব্রকণ্ঠে, গভীর গর্জ্জনের সহিত বলিতে লাগিল "অকল্যাণ ?—সে-কি বাদসা সাহেব ? মৃত্যুক্ষণে, তীক্ষ্ণ তরবারির নিম্নে দাঁড়ি হয়ে, আর কি অকল্যাণের ভয়ে, আমাকে ভীত কত্তে পারে ? মৃত্যুদণ্ডই-ত, আপনার শক্তি বিস্তারের, শেষ ও চূড়ান্ত আদেশ ! এই কয় মিনিট পরে আমার মস্তক দেহ হ'তে বিছিন্ন হয়ে, ধূলায় লুণ্ঠিত হবে, রক্ত-প্লাবনে মৃত্তিকা ভেসে যাবে, আর আপনি তা' দেখে, আপনার অসীম শক্তির পরিমাপ উপলব্ধি করে, একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাবেন ! বাদসা সাহেব ! দুনিয়ার কিছুই চিরস্থায়ী নয়, আপনার এ খামখেয়ালী যথেচ্ছাচারিতা, চিরদিনই একইভাবে আত্মপ্রকাশ কর্‌বার সুযোগ পাবে ? আপনি বাদসা,—কিন্তু খোদা দুনিয়ার সকলের বাদসা,—তাঁর অসীম বিধানের হাত কেউ এড়াতে পারে না, আপনিও পার্‌বেন না। সেই শেষ বিচারের দিনের জন্য আপনিও প্রস্তুত থাকবেন,—আপনার ভীষণ অত্যাচারের শাস্তি খোদা একদিন কর্‌বেন-ই। যদি এ না হয়, দুনিয়ার মালিক যদি পক্ষপাতশূন্য না হন, তবে এ দুনিয়া মিথ্যা,—খোদা মিথ্যা ! তাঁ'র উপর লোক আস্থা হারায়ে পাপের স্রোতে অবিচলিত চিত্তে চিরদিনই গা ভাসিয়ে দিত ! ভীষণ অত্যাচারের কবলে পরে, কেউ আর প্রতিকারের আশায় প্রাণ খুলে খোদা ! খোদা ! বলে, তাঁর নাম

উচ্চারণ কত্ত না। মৃত্যুদণ্ডই-ত আপনার ক্ষমতার চরম অত্যাচারের শেষ অস্ত্র! এ দিয়ে আপনি পবিত্র প্রণয়ের অচ্ছেদ্য আকর্ষণ, সংহত কত্তে চান? —এ দিয়ে স্বর্গের পুণ্য কুসুমের মন-মাতানো সৌরভ নষ্ট করে, পূঁতিগন্ধময় ব্যভিচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করাবার জন্য—প্রাণপণে চেষ্টা কত্তে চান? বাদসা সাহেব! মৃত্যু! সে-ত একটা অবস্থান্তর মাত্র! মতিয়া,—সে-ত আমার কাছে, চিরদিন আমার থাকবে,—মৃত্যুর পর আবার আমাদের অভেদ্য মিলন হ'বে,—সে দিন—সে শুভক্ষণ-ত বেশী দূরে নয়! সে অসীম মিলনের উপর বিপর্য্যয় আনয়ন কর্‌বার শক্তি বাদসার নেই,—সেই পুণ্য-দীপ্তোজ্জ্বল কিরণ নির্ব্বাপিত কর্‌বার শক্তি বাদসার নেই,—বাদসার শক্তি, সামর্থ্য সেখানে অতি ক্ষুদ্র, নিতান্ত নগণ্য, নিতান্ত অস্তিত্বহীন। সে যে মিলন, তার ধ্বংস নেই, বিচ্ছেদ নেই, বিরহ ক্লেশ নেই! আছে শুধু অসীম তৃপ্তি, অসীম শান্তি, সে তৃপ্তিই সকলের কাম্য! আপনাকে আর কি বুঝাব বাদসা সাহেব? ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যা'রা স্বীয় স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে এক পা যেতে চায় না, পরের অন্তরের অসীম যন্ত্রণা যা'দের অনুভব কর্‌বার শক্তি নেই,—বিলাস নেশায় যা'রা ভরপুর হয়ে, ছনিয়াকে একটা পূঁতিগন্ধময় নরকে পরিণত কচ্ছে তা'দের নিকট আর কি বক্তব্য থাকতে পারে? আর কি আপনাকে বুঝাব বাদসা সাহেব! আপনার অসীম মরুবক্ষের উপর ক্ষুদ্র জলধারার সৃষ্টি করার প্রয়াস যে নিতান্তই বাতুলতা! বাদসা সাহেব! যেভাবে জীবনযাপন কচ্ছি, এর চেয়ে মৃত্যু কি অধিক বাঞ্ছনীয় নয়? ভাই ঘাতক! এস, এ মুহূর্ত্তেই আমার মস্তক ছেদন করে, অসীম উদ্বেগের অবসান করে দাও!" বলিয়া হোসেন আলী দ্রুতগতিতে ঘাতকের সম্মুখীন হইয়া, তাহার মস্তক

নত করিয়া রহিল। ইহার পর বাকী রহিল তরবারির উত্থান, পতন,—তারপর সব শেষ! ঘাতক বিবর্ণ মুখে তরবারি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বাদসার ইঙ্গিত অপেক্ষা করিতে লাগিল! বাদসা সাহেব মোহাবিষ্টের ন্যায় একদৃষ্টিতে হোসেনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মতিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য অবলোকন করিল। সহসা তাহার মুখমণ্ডল আতপ-শুষ্ক-পদ্মের মত পরিম্লান হইয়া গেল। ভীত-ত্রস্ত নেত্রযুগলে একটা উৎকট বেদনার তীব্র আভাস জাগিয়া উঠিল,—বুকের ভিতর হঠাৎ বড় বেশী ব্যথা বাজিলেই হয়-ত সেই রকম ভীত-ত্রস্ত ব্যাকুলতা দৃষ্টির ভিতর ফুটিয়া উঠে! মতিয়া ছুটিয়া যাইয়া, হোসেন আলীর আনত মস্তকের উপর স্বীয় মস্তক সংলগ্ন করিয়া অশ্রু-জড়িতকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! আমি আপনার পুত্রবধূ হ'তে স্বীকৃত হলেম, এ নিরপরাধীকে, এম্‌নিভাবে হত্যা কর্‌বেন না, এ দৃশ্য যে কি ভীষণ, তা-ত আপনি ···।"

উপস্থিত অমাত্যবর্গ এতক্ষণ একটা অসীম উদ্বেগ-বহ্নির তাপে জর্জ্জরিত হইয়া নত মস্তকে বসিয়াছিল। তাহারা সহসা মতিয়ার স্বীকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মতিয়া তুমিই ধন্যা! অমূল্য নারীরত্ন তুমিই।"

বাদসার আদেশে ঘাতক তাহার তরবারি স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। দুইজন পরিচারিকা আসিয়া মতিয়াকে, অন্দর মহলে লইয়া গেল। বাদসা স্বয়ং হোসেন আলীর হস্ত ধারণ করিয়া, তাঁহার খাস কামরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে—সাহাজাদা এবং দৌলতন্নেছার বিবাহ-বার্ত্তা, বাদসার আদেশে, চারিদিকে প্রচারিত হইল। মতিয়া ও হোসেনের বিষয় সমস্তই গোপনে রাখা হইল। পরদিন সন্ধ্যা

সাতটায় বিবাহের সময় নির্দ্ধারিত করা হইল এবং বিবাহ উদ্যোগে সকলেই, পরম উৎসাহে আত্মনিয়োগ করিল।

বাদসার আদেশে, কাজি সাহেবকে ও ওস্তাদজী - বৈরম আলীকে এ বিষয়ে কিছুই জানান হইল না। গোপনেই উদ্বাহ কার্য্য সমাপন করাইবার উদ্দেশ্যে, তাহাদিগের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদের একটি সমৃদ্ধ, প্রশস্ত কক্ষের সম্মুখে, উন্মুক্ত বারান্দায়, সাহাজাদা একখানা আরাম কেদারায় উপবেশন করিয়া, ভরা ভাদরের পূর্ণ নদীর মতই, উচ্ছ্বসিত বক্ষে, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

দ্বাদশীর চন্দ্রের আলোকে, চারিদিক উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়। অদূরে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ,—পার্ব্বত্য নদীটি, আঁকিয়া বাঁকিয়া, দুকূল ভাসাইয়া, জ্যোৎস্নার রজত-ধারায় খচিত হইয়া, হীরক হারের মতই ঝলমল্ করিতেছিল। তটিনীর সলিল-সম্পৃক্ত শীতল নৈশ-বায়ু সাহাজাদার অঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া, তাহার শোণিত-শিরায় প্রলেপ বুলাইয়া দিতেছিল।

সাহাজাদার অন্তর আজ অনেকটা আশ্বস্ত ও শান্ত। একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির মন-মাতানো ভাব, তাহার ঢলঢল মুখে, চোখে, মাখান রহিয়াছিল। বিজয়পূর্ণ আনন্দের একটা হর্ষচ্ছটায়, তাহার

আশা-হত মলিন মুখখানা, এতদিন পরে, আজ সুখোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল!

সাহাজাদা নীরবে বসিয়া, ভাবিতেছিল,—মতিয়ার সম্মতিজ্ঞাপক উক্তির কথা! দু'দিন পরে আমি বাদসার আসনে উপবেশন করব, দু'দিন পরে দুনিয়ার মালিক-ত হ'ব আমিই! কাজেই মতিয়া বেগম হবার এতবড় প্রলোভন, পদদলিত কত্তে কিছুতেই সমর্থ হবে না! আগামী কল্য, এম্নি সময়ে, মতিয়া তা'র ছোট্ট যুঁইফুলের মত সুন্দর সুমধুর হাসিমাখান মুখখানি নিয়ে, আমাকেই স্বামীরূপে গ্রহণ করবে! আর আমি একটা পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর হয়ে, আমার অন্তরের প্রেমপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস নিয়ে, কামনা ব্রতীরূপেই মতিয়াকে বক্ষে ধারণ করে, অন্তরের অসীম গ্লানির অবসান করব। মতিয়াকে সেই-ত কয় মিনিট মাত্র দেখেছি, সেই কয় মিনিটের স্মৃতিই আমাকে মস্‌গুল করে রেখেছে! মতিয়া রূপসী, বিদুষী, নম্রকন্ত্র,—দৌলত তা'র তুলনায় অতি ক্ষুদ্র,—অতি নগণ্য! মতিয়ার জন্ম,—বাদসার ভোগের জন্যই,—আর দৌলত,—হোসেন আলীর মত দরিদ্রের কণ্ঠহার হবারই উপযুক্ত। রূপসী নব-যৌবনা মতিয়ার সঙ্গই যে আমার একান্ত ইপ্সিত, একান্ত বাঞ্ছিত! বলপ্রয়োগে সেই হতভাগিনীকে, ভগ্ন-ক্রীড়নকের মতই অবস্থান্তর ঘটাইয়া, সে যে তাহাকে কামনা পরিতৃপ্তির উপাদান ছাড়া, অন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারে নাই, তাহা তাহার ধারণার অতীত ছিল এবং তজ্জন্য সে আপনাকে এতটুকুন স্বার্থপর ও মদান্ধ বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছিল না।

সাহাজাদা যখন মতিয়ার স্মৃতিতে একান্ত আত্মহারা, ঠিক এম্নি সময়ে দৌলতন্নেছা, ধীর-মন্থরগতিতে সাহাজাদার সম্মুখে আসিয়া

রহিল,—এবং রক্তশূন্য বিবর্ণমুখে, লজ্জার ঈষৎ উত্তপ্ত আরক্ত আভা বিচ্ছুরিত করিয়া, যেন কেমন অভিভূতবৎ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল।

দৌলতন্নেছার অযত্ন রক্ষিত, কেশপাশ—বন্ধন মুক্ত! উহারই কয়েকটি ক্ষুদ্র গুচ্ছ, শিথিলীভূতভাবে, তাহার বিকশিত শতদল পদ্মের মতই, অপরূপ কমনীয় মুখের আশেপাশে, যেন মুগ্ধ ভ্রমরের মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার আয়ত বিশাল নেত্রদ্বয়, বিস্ময় ও আশঙ্কাচ্ছায়ায় মথিত। অসীম অভাবনীয় উত্তেজনায় বক্ষোবাস মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল। তাহার অসম্বদ্ধ বেশবাস, উত্তেজনার ঘনশ্বাসে, অনেকটা স্খলিত হইবার উপক্রম হইতেছিল। তাহার জ্যোৎস্নার মত সুগৌর মুখকান্তি, যেন অগ্নিতাপতপ্ত বস্তুর ন্যায়, লোহিতাভা ধারণ করিয়াছিল।

সাহাজাদা সহসা সচমক চকিত কটাক্ষে দৌলতন্নেছার প্রতি তাকাইয়া, পর মুহূর্ত্তেই মস্তক নত করিল। শত অপরাধীর মতই শঙ্কাকুলচিত্তে যেন কয়েক মিনিট নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে বিস্ময়-স্তব্ধ-নেত্রে, দৌলতের চোখের উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া, কৌতূহলমাখা করুণকণ্ঠে বলিল "দৌলত! কি মনে করে এ সময় এলে?"

প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া দৌলতন্নেছা যেন মুস্‌ড়িয়া পড়িল। একটা জ্বালাভরা অসীম অস্বস্তির সংঘাতে, তাহার অন্তরটা যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইল। শেষে শরীরের সমস্ত শক্তি যেন একত্র জড় করিয়া, দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল "প্রিয়তম! এরূপ প্রশ্ন আজ তোমার নিকট নূতন শুনলেম, আরও অনেক দিন-ত আমি এমনি সময়ে এসেছি,—কৈ তুমি-ত কোনদিনই এতটা থতমত

খেয়ে, এভাবে প্রশ্ন কর-নি। মানুষ যখন অভাবনীয় বিপদে পড়ে—উদ্ধারের পন্থা খুঁজে বের কত্তে পারে না, তখন সে সামান্য একটা সূক্ষ্ম-তন্ত্রী শেষ অবলম্বন করে, বিপদ স্খালনের, শেষ চেষ্টা করে থাকে। আমারও আজ সে অবস্থা,—আমিও একটা মিথ্যা আশায় হয়-ত—তেম্‌নি কিছু কত্তে অগ্রসর হয়েছি। মন মান্‌ছে না, তাই আজ মান অভিমান বিদায় দিয়ে, তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে সাহসী হয়েছি। তুমি সবই জান,—তবু এম্‌নি ধারা প্রশ্ন করার অর্থ,—আম্যর মনে হয়, উত্তপ্ত অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন করে, তা'র প্রচণ্ড তাপ বর্দ্ধিত করার প্রয়াস ছাড়া,—আর কিছু নয়-ই। এতে যদি তুমি তৃপ্তি পাও, তাও তোমার এই অসীম দান,—মাথা পেতে নিব-ই।"

সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "দৌলত! আমাকে ক্ষমা কর। পূর্ব্ব স্মৃতি সব ভুলে যাও,—বাবা যেভাবে আমাদিগকে পরিচালনা কত্তে চাইছেন, তাই-ত মাথা পেতে নিতে হ'বে। এর ব্যতিক্রম ঘটাবার উপায় নেই-ই। তবে মিছামিছি কেন,—এম্‌নিভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে, শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট কচ্ছ? হোসেন আলী সুপুরুষ,—বিদ্বান লোক। সৎপাত্রেই তোমাকে অর্পণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।"

দৌলতন্নেছার,—সাহাজাদার দৃঢ় অভিব্যক্তিতে, একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে নিতান্ত উন্মত্তের মতই,—ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল। অতি কষ্টে কয়েক মিনিটকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া,—অন্তরের প্রচণ্ড বিপ্লব গোপন রাখিতে সচেষ্ট হইল। শেষে নিতান্ত সহজ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জকস্বরে বলিল "প্রিয়তম! তুমি—তুমি আজ এম্‌নিভাবে আমাকে প্রবোধ দিতে,—এতটুকুন কুণ্ঠা বোধ কর-নি? তুমিই-ত শিখিয়েছিলে, স্ত্রীলোক যাঁকে একবার

স্বামীরূপে বরণ করে, তিনিই তা'র জীবনে দেবতারূপে চিরকাল বিরাজমান থাকেন,—বাছাই করা জিনিষটা ভালবাসা রাজ্যের ভিতর একটা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার !—সেই তোমার মুখে এ ধরণের উপদেশ আজ যেন কেমন শুনাচ্ছে !—সুন্দর ও বিদ্বান, এ মাপকাঠী নিয়ে যদি স্বামী গ্রহণ করার সুনিয়ন্ত্রিত পথ আবিষ্কৃত হয়, তবে আমার মনে হচ্ছে, একমাত্র তা'দেরই স্ত্রী সংগৃহীত হওয়া উচিত,—ভালবাসা জিনিষটা একমাত্র তা'দেরই একচেটে সম্পত্তি হওয়া উচিত,—যা'রা সুন্দর ও বিদ্বান বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে ! কিন্তু তা'ত প্রণয়-রাজ্যের নিয়ম নয়—মনের অসীম টানের উপরই এর ভিত্তি সুগ্রথিত !—আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি,—তোমার স্নেহ লাভ কর্‌বার সুবিধা তুমিই আমার করায়ত্ত করিয়েছ,—এখন তুমি তা' ফিরিয়ে নিতে চাইলেও,—সে অমূল্য দান পরিত্যাগ করার উপায়-ত আমার নেই। তুমিই আমার উপাস্য ও কাম্য ! চিরকাল তুমি তা'ই থাক্‌বে,—আমাকে বিলিয়ে দেবার প্রবৃত্তি তোমার অন্তরে জাগরিত হলেও, আমার অন্তরে সেরূপ কোন ভাব-ত স্থান পেতে পার্‌বে না ! বাদসা সাহেবের ইচ্ছায় এর কোন ব্যবস্থাই-ত হয়-নি। তোমার একান্ত ইচ্ছার উপর না এত বড় অভাবনীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান চল্‌ছে !—তোমার মত পরিবর্ত্তন করে দেখ,—সব গোলযোগ এক মুহূর্ত্তে মিটে যাবে। তোমার মতের উপরই-ত আমার সুখ, শান্তি,—ইহকাল পরকাল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কচ্ছে ! বল—তুমি,—আমারি থাক্‌বে ? আমাকে এম্‌নি করে অপরকে বিলিয়ে দিবে না ?"

বর্ষায় নদীর বুক যখন ভরিয়া উঠে, তখন সে নিজের কল্ কল্ তানেই ভরপুর হইয়া বহিয়া চলে। অপরের কথা ভাবিবার সময়

সে পায় না। সাহাজাদারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। সে ক্ষণিকের জন্য, লজ্জায় গাঢ় রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল "আমার মন যাকে পাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে,—যাকে পাবার জন্য আমি উন্মত্ত অধীর চিত্তে দিনের পর দিন কাটিয়ে, মিলনের সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা কচ্ছি,—তুমি কি মনে কর, তোমার অনুরোধে, তোমার শান্তির জন্য, তা'কে "পর" করে দিয়ে, চিরকাল অনুতাপানলে, জ্বলে মর্‌ব? সাধারণ মানুষের পক্ষে যে নিয়ম প্রযোজ্য, বাদসার ভাবী উত্তরাধিকারীর পক্ষে সে নিয়ম খাট্‌তে পারে না। তুমি আমাকে ভালবাস, আমাকে পাবার জন্য উদ্বিগ্ন,—এর ভিতর নূতনত্ব কিছুই নেই। বাদসার বেগম হবার লোভ, স্ত্রীলোক মাত্রেরই হয়ে থাকে। আমি যে একমাত্র তোমাকে নিয়েই জীবনযাত্রার একমাত্র উন্মুক্ত পথ মেনে নিব, এরূপ কোন নিয়ম নেই। আমার ভোগের সামগ্রী, কোনদিনই, গণ্ডীবদ্ধ থাক্‌তে পারে না,—কিংবা গণ্ডীবদ্ধ থাকে, এরূপ আমার ইচ্ছা নয়! আমি মতিয়াকে চাই,—এর প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি হ'তে চাইলে,—যেটুকুন স্নেহ, ভালবাসা, এখনও আমার নিকট তুমি দাবী কচ্ছ,—হয়-ত তা'ও চিরদিনের মত হারিয়ে ফেল্‌বে।"

বজ্রের জ্বালাভরা ঝাঁজের মতই, সাহাজাদার কঠোর উক্তি শ্রবণ করিয়া, দৌলতন্নেছার অন্তরের সমস্ত রক্ত অকস্মাৎ আগুনের মত উত্তপ্ত হইয়া গেল। তাহার নীরক্ত অধর সহসা দারুণ শৈত্যে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হৃদ্‌যন্ত্র যেন অসাড়—আড়ষ্ট হইয়া, জমিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাহার যন্ত্রণাবিদ্ধ মন যেন, আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে চাহিতেছিল,—ওগো! আমি যে তোমার দৌলত,—

আশৈশব হ'তে তুমি যা'কে তোমার অসীম স্নেহ ও করুণায় অভিষিক্ত করে আস্‌ছিলে,—এ ত্বনিয়ায় সে-যে তোমাকেই একমাত্র আরাধ্য বলে চিনে নিয়েছিল—সেই-ত তুমি,—আজ একি পরিবর্ত্তন! আজ তুমি তাকে এম্‌নি নির্ম্মম কথা শুনাতে দ্বিধা বোধ কর্‌লে না? তুমি যা' সহজভাবে বলে গেলে, তা'র প্রতি অক্ষর যে আমার হৃদয় শতধা করে ছিন্ন করে দিয়ে গেল! কেন তুমি আমাকে পথের ধূলা হ'তে কুঁড়িয়ে নিয়ে, বুকের হার কর্‌বার প্রলোভন দেখায়ে, একেবারে সখাত-সলিলে, ডুবিয়ে দিতে চাইছ? অতঃপর কয়েক মুহূর্ত্ত নত মস্তকে, নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, দৌলতন্নেছা দৃঢ়তার সহিত, বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিল "প্রিয়তম! তুমি এতটা নির্দ্দয় হ'বে, তা'ত কোনদিনই বুঝ্‌তে পারি-নি। তোমাকে না পেলে, আমার বাঁচা-মরা যে সমান হয়ে দাঁড়াবে! তোমার শত শত দাসীর মধ্যে না হয়, আমাকে একজন বলে মেনে নাও। তোমাকে সেবা কর্‌বার অধিকারটুকুন আমাকে ফিরিয়ে দাও; দশজনের মধ্যে আমিও একজন হয়ে, তোমার সেবায় জীবন কাটিয়ে দোব। এ অধিকার হ'তে আমাকে বঞ্চিত কর না, আমাকে এম্‌নি করে অপরের হাতে বিলিয়ে দিয়ে, চিরদিনের মত "পর" করে দিও না,—এতটুকুন ভিক্ষাও কি আমি তোমার নিকট দাবী কত্তে পারি না,—আজ মরণ-পথে দাঁড়ায়ে,—এই শেষ প্রার্থনা জানাবার জন্য তোমার নিকট এসেছি। তোমার সামান্য মত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আমার জীবনের সমস্ত অশান্তির যে অবসান হয়ে যেতে পারে!"

সাহাজাদা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল "না—তা'ত হবার উপায় নেই! আমার-ত এতে আর কোন হাত নেই,—দৌলত! আমি মতিয়াকে গ্রহণ কর্‌লে, বাবা কিছুতেই তোমাকে আমার কণ্ঠলগ্ন হ'তে দিবেন

না। এরূপ একটা প্রতিশ্রুতি তিনি অনেকদিন হয় আমার নিকট হতে আদায় করেই—না, তিনি শেষে এত বড় ব্যাপারে আপনাকে জড়িত করেছেন! মতিয়া আমার হ'লে,—হোসেন আলীর হস্তেই তিনি তোমাকে অর্পণ কর্‌বেন। হোসেনের উপর যে অত্যাচারের ব্যবস্থা হচ্ছে, তা'র কথঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্যই তিনি স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তোমার বাঁচা-মরার কথা বল্‌ছ,—সে একটা কথার কথা! এটা মনে রেখো, বাদসার উত্তরাধিকারী,—তোমার মত শত শত ভালবাসার পাত্রীর মৃত্যুতে, এতটুকুনও বিচলিত হ'তে পারে না। তা' যদি হয়, তবে তা'র মান মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পার্‌বে না। মৃত্যু যত সহজ বলে তুমি মনে কর, তত সহজ ব্যাপার নয়-ই! হোসেনকে পেলে, আবার দেখ্‌বে, সব ঠিক হয়ে গেছে! হোসেন আলীই আবার আরাধ্য হয়ে উঠ্‌বে, এ হচ্ছে স্ত্রী চরিত্রের বিশেষত্ব। মরণের ভয় দেখিয়ে, আমাকে শঙ্কান্বিত কর্‌তে চেষ্টা করো না,—এ'তে কোনই সুফল ফল্‌বে না।"

উপর্য্যুপরি আঘাতের প্রবলতায় দৌলতের রোদন-বিবশ-চিত্ত,—সুগভীর অভিমানে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্‌শক্তি যেন বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। একটা প্রবল আত্মগ্লানি ও মর্ম্মান্তিক ধিক্কার সে আপনার ভিতর অনুভব করিল! তাহার মনে হইতে লাগিল—এম্‌নিভাবে তা'কে লাঞ্ছিত না করে, নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত কর্‌লেও তা'র পক্ষে এত বড় নিদারুণ ও অসহনীয় হ'ত না। ......তাহার হৃদয়-বীণা যেন, এই বাক্য-বাণের কঠোর আঘাতে,—একেবারে ছিঁড়িয়া পড়িল। সে স্তব্ধ-অসাড়-বেদনা-পাণ্ডুর-মুখে—ঈপ্সিতের মুখের প্রতি আহত-নেত্রে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁপাইয়া

ফোঁপাইয়া কাঁদিল। একটা অব্যক্ত ব্যথা মুহুর্মুহুঃ তাহার ভিতরটা ফাটাইয়া দিবার জন্য, অসীম বেগে পীড়ন করিতে লাগিল! দৌলতন্নেছা অতি কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া, রোদন-রুদ্ধ-স্বরে, সকাতরে বলিল "স্ত্রী চরিত্রের যেটুকুন উপলব্ধি করে,—তুমি আজ বিশেষজ্ঞ সাজ্‌তে চাইছ, আমার মনে হয়, তা'র আগাগোড়াই, বৈচিত্র্যপূর্ণ ভ্রমাত্মক ছাড়া আর কিছু নয়-ই! আশৈশব তোমার ছায়া অনুগমন করেই চল্‌তে চেষ্টা করেছি, এতটা মাখামাখির সংস্পর্শে এসে, তুমি যদি, আমার ভিতর সেরূপ পুঁতিগন্ধময়, কোন বিশেষত্বের সন্ধান পেয়ে থাক, তবে সে-টা হয়-ত, আমার সময়োচিত নিতান্ত দুরদৃষ্টের ফল বলেই ধরে নিতে হবে! তবে আমার অন্তর-নিহিত, যা' কিছু আছে,—তা' যদি বিশ্লেষণ করে দেখাতে পার্‌তুম,—তবে দেখ্‌তে, আমার অন্তরের প্রতি পর্দ্দায়, তোমার মোহন-ছবি অঙ্কিত রয়েছে! সেখানে আর কোন কিছুর স্থান হবার সম্ভাবনা নেই! একমাত্র, স্বামী-বিরহে উন্মত্তাধীর স্ত্রীলোকই মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হয়ে থাকে; কিন্তু স্ত্রীর জন্য পুরুষ, প্রাণত্যাগ করেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত, ইতিহাসের পাতায় খুবই কম। মৃত্যু,—সে-ত অতি তুচ্ছ কথা! এত বড় অভিসম্পাত মাথায় তুলে নিয়ে, জীবনধারণ করার চেয়ে, আমার পক্ষে, মৃত্যুকে বরণ করাটা কি খুবই লোভনীয় নয়? যে অসীম জ্বালা বুকে করে—জীবনধারণ কচ্ছি, তার পরিসমাপ্তি খুঁজতে গেলে, মৃত্যুই যেন, শান্তিলাভের একমাত্র প্রশস্ত মুক্ত-পথ বলে মনে হচ্ছে! অনেক আশা করেই আজ তোমার নিকট এসেছিলুম, এভাবে, এতটা শেল-বাক্য তুমি প্রয়োগ করবে বলে যদি ধারণা কত্তে পাত্তুম, তবে হয়-ত তোমাকে বিরক্ত কত্তে কখনও আসতুম না,—আমার অপরাধ ভুলে যাও, ক্ষমা করো,

আর যেন তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক সেজে, তোমার সুখের-পথে কণ্টক বিস্তীর্ণ না করি। এতটুকুন শক্তি কি খোদা আমাকে দিবেন না? ঐ দাসীকে যদি কোনদিন, মনে কর্‌বার অবকাশ হয়, তবে ভেবে দেখো, কত বড় মর্ম্মন্তুদ যাতনা নিয়ে আজ তোমার নিকট এসেছিলুম, আর কত বড় আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে, আমার এই অভিশপ্ত জীবনের লীলা সাঙ্গ কর্‌বার সঙ্কল্প নিয়ে, তোমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ কচ্ছি! না—আর-ত পারি না, বিদায়—।” বলিয়াই দৌলতন্নেছা পাগলিনীর ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিল!

দৌলতন্নেছা বাহিরে আসিয়া, একাকী দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া ক্রন্দন করিল। শেষে ত্বরিতপদে আমিনার শয়ন কক্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে প্রহরী তরবারি হস্তে পদচারণা করিতেছিল, দৌলতন্নেছা তাহার প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিল “প্রহরি! দ্বার খুলে দাও,—আমি ভিতরে যাব।”

প্রহরী করজোড়ে, নতজানু হইয়া, বিনম্রকণ্ঠে বলিল “সাহাজাদি! ভিতরে প্রবেশের হুকুম-ত কারো নেই, বড়ই কড়া আদেশ, গর্দ্দান যাবার ভয়-ত আমার রয়েছে।”

দৌলতন্নেছা মাতালের মত টলিতে টলিতে, বাষ্পার্দ্রকণ্ঠে বলিল “কোন ভয় নেই প্রহরি! আমি হুকুম দিচ্ছি, সব দোষ আমিই মাথায় করে নিব। দ্বার খুলে দাও। পনর মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে যাব।”

প্রহরী—দৌলতন্নেছার মনের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করিল। একটা অসীম সহানুভূতিতে তাহার অন্তর ছাইয়া গেল,—সে আর কোনই প্রতিবাদ না করিয়া, নিজ দায়ীত্বে,—দরজার অর্গল মুক্ত করিয়া

দিল। দৌলতন্নেছা কক্ষে প্রবেশ করিতেই, প্রহরী আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

দৌলতন্নেছা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, উপুড় হইয়া পড়িয়া, আমিনার বক্ষে দেহভার সংন্যস্ত করিল,—এবং অজস্র অশ্রুপ্লাবনে তাহার বক্ষ সিক্ত করিয়া, উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। আমিনা দৌলতের অভাবনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, একেবারে হতভম্ব বনিয়া গেল! একটা বুকফাটা আর্ত্তনাদে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল! বিরক্ত-তিক্ত-হতাশ-চিত্ত লইয়া আমিনা বহু চেষ্টায় তাহাকে অনেকটা শান্ত করাইয়া, সমস্ত ঘটনার সারমর্ম্মটুকুন সংগ্রহ করিয়া লইল। আগামী কল্য কাজী সাহেবের অজ্ঞাতসারে মতিয়া ও সাহাজাদার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করান হইবে,—এই সংবাদে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। একটা অবসাদে তাহার সমস্ত দেহ-মন সহসা যেন একেবারে শিথিল হইয়া গেল! আমিনা ভাবিতে লাগিল,—এ বিবাহের পরিণাম যে ভয়ানক গুরুতর! কয়টী নিরপরাধী প্রাণীর জীবননাশের আশঙ্কা যে এতে বিদ্যমান। এখন সে কি কত্তে পারে? সে যে বন্দী। এক পা'ও যে তা'র চল্‌বার ক্ষমতা নেই। কাজী সাহেব অনেকদিন বলেছেন, সাহাজাদার ও মতিয়ার বিয়ে হওয়াটা, নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তিনি বেঁচে থাকতে, এরূপ মিলন, কোন দিনই হ'তে পারবে না। এর ভিতর হয়-ত কোন গূঢ়-রহস্য বিদ্যমান আছে, ডাকাতকর্ত্তৃক অপহৃত হবার পর হতে, মতিয়া ও হোসেনের সংবাদ তিনি কিছুই সংগ্রহ করে উঠ্‌তে পারেন নি, কত চেষ্টা করেছেন,—কোন ফল হয় নি। তাঁকে এ সমস্ত সংবাদ জানাতে পারলে, হয়-ত কোন প্রতিকার হতেও পারে। অতঃপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দৌলত! শুধু কাঁদ্‌লে কোন ফল হবে না,—বিপদে ধৈর্য্যহারা

হয়ো না। তোমাদের রক্ষার জন্য আমি বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, কিন্তু কিছু কত্তে পারলুম না, আজ আমি বন্দী, পরিণাম ফল যে কি দাঁড়াবে তা'ও জানি না, আমার জীবন দিয়েও যদি হোসেনের উপকার কত্তে পাত্তুম, তবেই আমার এ উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হত! যাক্ সে কথা, আচ্ছা দৌলত! তুমি যদি একটা কাজ কত্তে পার, তবে আমি এ কারাগারে আবদ্ধ থেকেও শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌তাম,—বল পারবে?"

দৌলতন্নেছা তাহার আগ্রহান্বিত দৃষ্টি আমিনার মুখের উপর সংন্যস্ত করিয়া বলিল 'কি কত্তে হবে আমাকে আমিনা দিদি? বল,—আমি চেষ্টা করে দেখ্‌ব।"

আমিনা দৃঢ়স্বরে বলিল "আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে—যদি কাজি সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিতে পার,—তবে কোন ফল হলেও হতে পারে? বল পারবে? ধরা পড়্‌লে আর আমার রক্ষা থাক্‌বে না!"

দৌলতন্নেছা দৃঢ়তার সহিত বলিল "তা পাঠাতে পারব বলেই-ত মনে হয়, আমিনা দিদি! দাও তুমি চিঠি লিখে! তবে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে যে বিশেষ কিছু হবে, এমন-ত মনে হচ্ছে না!"

আমিনা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই চিঠি লিখার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিল এবং দৌলতন্নেছার হস্তে চিঠিখানা অর্পণ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। দৌলতন্নেছা চিঠি হস্তে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সঙ্কেত করিতেই, দ্বার খুলিয়া গেল। সে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিল। প্রহরী পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর,—বাদসার অন্দরের সকলেই বিবাহ উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। নিম্নতম কর্ম্মচারীবর্গ ছুটাছুটি করিয়া,—তাহাদের অসীম কার্য্যতৎপরতা সপ্রমাণ করিতেছিল। যাহারা কাজের লোক, নীরবে তাহারাই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া যাইতেছেন,—আর যাহারা অলস,—কোন কাজ করিতে চাহিতেছিল না,—তাহারা বাক্যবিন্যাসে, চারিদিক মুখরিত করিতেছিল। ইহাই দুনিয়ার নিয়ম,—এ নিয়মই দুনিয়া চলিতেছে!

বাদসা সাহেব বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ, আয়োজন শেষ করিয়া,—বিশ্রাম কক্ষের, সাটিন মোড়া আরাম কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া, রূপার গুড়গুড়ী হইতে, সোণার মুখনলে ধূম আকর্ষণ করিতেছিলেন। ঘরের মেঝের উপর—বহুমূল্যের সতরঞ্চ পাতা,—চারিধারে কাঠের আসবাবে সুসজ্জিত। দেয়ালে, কাঁচের ফ্রেমে আটা, সোণার অক্ষরে লেখা, চারিদিকে কোরাণের "বয়েৎ" টাঙ্গানো রহিয়াছিল। বাদসা সাহেব নীরবে বসিয়া,—আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন;—দৌলত, হোসেনকে স্বামীরূপে গ্রহণ কত্তে একান্ত অনিচ্ছুক,—এদিকে মতিয়াও

পুত্রবধূ হ'তে নারাজ! একরকম জোর করে,—এ বিবাহে তা'কে সম্মতি জ্ঞাপক উক্তি, পুনরায় আদায় করান হয়েছে;—এ অবস্থায় এ দুই বিবাহের শেষ পরিণাম যে কি হবে খোদাই বল্‌তে পারেন! দৌলতকে শৈশব হ'তে,—আপন কন্যার মত লালনপালন করে, এত বড় করেছি। পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করে, ঘর সংসার পেতে দিবার সঙ্কল্প নিয়ে,—সে ভাবেই তাকে অনুপ্রাণিত করেছি। হঠাৎ পুত্রের ভাবান্তর দেখে, কেমন একটা জেদের বশবর্ত্তী হয়ে, আমিও একটা অভাবনীয় অরাজকতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হয়েছি! একমাত্র পুত্র,—তা'র সুখের জন্য না করেই বা কি করি? হেসেন খুবই আদর্শ ছেলে,—এর উপর অযথা অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। দৌলতকে তা'র হস্তে অর্পণ করে—অবিচারের মাত্রাটা, অনেকটা হাল্‌কা কর্ত্তে চাইছি। রাত্রি সাতটায় বিবাহ কার্য্য শেষ করে,—তবে কাজি সাহেবকে, আ'নবার জন্য লোক পাঠাব। এ বিষয়ে তাঁ'কে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল্‌ব,—তিনি যদি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তা'তে আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই;—বাদসার কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়াটা যে গুরুতর অপরাধ, তা' তাঁ'কে বুঝিয়ে দিয়ে, তাঁ'র অন্তরের উত্তেজনার উপশম করে দোব। কাজী সাহেব এ ক'দিনের মধ্যে, দুবার এসে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছেন, আমি তাঁ'র আবেদন অগ্রাহ্য করেছি। এতটা করা-ত ঠিক হয় নি! তাঁ'র কোন প্রতিবাদই যখন আমি গ্রাহ্য কর্‌ব না,—সে অবস্থায় তাঁ'র নিকট এতটা লুকোচুরি করার কোনই প্রয়োজন দেখি না। কন্যা বেগম হবে, এ-ত তাঁ'র আনন্দের বিষয়! কন্যার অমতে বিয়ে হচ্ছে বলেই-ত তিনি—এ কার্য্যে প্রতিবন্দী সেজেছেন। বিয়ের পরে আমার মনে হয়, সবই ঠিক হয়ে যা'বে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাদসা সাহেবের চিন্তাস্রোতে বাধা প্রদান করিয়া, একজন প্রহরী আসিয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক জানাইল,—"কাজী সাহেব, বাহিরে অপেক্ষা কচ্ছেন,—আদাব জানিয়েছেন,—তিনি হুজুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

বাদসা সাহেবের মুখমণ্ডলে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

কাজী সাহেব—প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, লম্বা সেলাম করিয়া কহিলেন—"সেলাম ওয়ালেকুম।"

"ওয়ালেকুম সেলাম"—বলিয়া বাদসা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাজী সাহেবকে আনিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া, নিজে আসন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর নানা প্রসঙ্গে উভয়েই প্রায় পনর মিনিটকাল অতিবাহিত করিলেন।

কাজী সাহেব কথা প্রসঙ্গে একটা শুভ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বলিলেন "খোদাবন্দ! আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটী কথা বল্‌বার জন্য আজ আপনার নিকট এসেছি। যে বিষয়টি আমি এতদিন গোপন রেখে,—কয়েকটি নিরীহ প্রাণীর অশান্তির ইন্ধন যোগাতে সহায়তা করেছি,—তাই আজ আপনার নিকট প্রকাশ করে,—আমার জীবন-নাটকের যবনিকা ফেলে দোব।"

বাদসা সাহেব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কাজী সাহেবের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন "তা' আপনি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারেন।"

কাজী সাহেব জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! আমার বক্তব্য, সাহাজাদার শ্রোতিগোচর করান খুবই বাঞ্ছনীয়। আর মতিয়া—সেও পার্শ্বের কক্ষে বসে, আমার সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করবে, এ হচ্ছে আমার শেষ প্রার্থনা।"

বাদসা সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া আমার প্রাসাদে অবস্থান কচ্ছে,—এ সংবাদ আপনাকে কে দিল ? কে আপনাকে এরূপ সংবাদ দিয়েছে, তা'র নাম আপনাকে প্রকাশ কত্তেই হবে।"

কাজী সাহেব নিতান্ত সহজভাবে বলিলেন "কেমন করে জেনেছি, এবং কে আমাকে খবর দিয়েছে, সবই আমি আপনাকে জানায়ে দোব; কিছুই গোপন করব না। তবে মতিয়া ও হোসেন যে আপনার আশ্রয়ে আছে তা' আমি অবগত হয়েছি। আমার বক্তব্য শ্রবণ করলে আপনি বুঝতে পারবেন, আমি কত বড় গূঢ় রহস্য গোপন করে, মতিয়াকে প্রতিপালন করেছি,—কত বড় প্রাণের টানে এবং তা'কে চিরদিনের মত দাবী-হারা করবার আশঙ্কায়, তা'কে এত বড় অশান্তিতে ফেলে দিয়ে, নীরবে বসে আছি! যখন সে নিগূঢ় তথ্য গোপনে রেখে তা'দের অশান্তি স্খালনের কোনই প্রতিকার কত্তে পারি নি,—এ অবস্থায় মনে করেছি, সমস্ত প্রকাশ করে দিয়ে, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অস্বস্তির অবসান করে ফেলব।"

বাদসা সাহেব কাজী সাহেবের উক্তি শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্টের মতই অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, শেষে কাজী সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর, পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাদসা সাহেব, সেই কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আসন গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া, বাদসা সাহেব কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার কন্যা মতিয়া—পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান কচ্ছে, আপনার বক্তব্য শেষ করে ফেলুন, সে ওখানে বসেই, সমস্ত কথা শুনতে পারবে।"

কাজী সাহেব একটুকুন ইতস্ততঃ করিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেন "খোদাবন্দ! আপনার বেগম, দলিয়ার স্মৃতি হয়-ত এখনও বিস্মৃত

হন নাই। আপনি তা'কে সামান্য অপরাধে সাত মাস গর্ভাবস্থায় জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করেছিলেন, তা' হয়-ত ভুলে যেতে পারেন নি। দলিয়া ছিল আমার নিকট আত্মিয়া,—ভাগিনী—তা'র মত সতী, সাধ্বী, কর্ম্মঠা স্ত্রী লাভ করা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে উঠে না। আপনি তার সাত মাস গর্ভ উপেক্ষা করে, মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা বোধ না করে থাকলেও, মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার ধ্যান করেছে। তার পতি-অনুরাগপূর্ণ উক্তিগুলি শুনলে, নিতান্ত পাষাণও হয়-ত গলে যেত। সে যাক্,—পরের কথা পরে বল্‌ব। তা'কে যখন জীবন্ত সমাধির জন্য কবরের নিকট দাঁড় করান হয়, আমি তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম। সে সেই শেষ মুহূর্ত্তেও আপনার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করে আমাকে বল্‌ল----মামু! বাদসার আদেশ—আমি হাসিমুখে প্রতিপালন কত্তে প্রস্তুত হয়েছি। তবে আমার গর্ভে বাদসার স্মৃতিচিহ্ন যে বিদ্যমান রয়েছে! কি দোষে গর্ভস্থ শিশু আমার ন্যায় শাস্তি ভোগ করবে? তাঁ'র স্মৃতিচিহ্নটুকুন যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিন। প্রসবের পর আমি স্বহস্তে আমার জীবনলীলা শেষ করে ফেল্‌ব—এ বিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞা কত্তে প্রস্তুত আছি। বাদসা সাহেব! তা'র সেই কাতর বিলাপ শ্রবণ করে, আমি স্থির থাকতে পারি-নি, আপনিও হয়-ত পারতেন না। আমি তা'কে আমার বাড়ীতে নিয়ে প্রতিপালন করেছি। এদিকে প্রকাশ করে দিয়েছিলুম, দলিয়ার জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে! তা'র পর বাদসা সাহেব, দশ মাস অন্তে, দলিয়া মতিয়াকে প্রসব করল। যে দিন মতিয়ার জন্ম হয়, তা'র পরদিন আমারও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ জন্মের দু'দিন পরেই, আমার সে কন্যার মৃত্যু হয়। আর আমার কোন সন্তানাদি হয় নি। আমি এখন নিঃসন্তান!

আমার স্ত্রী সেই কন্যা হারিয়ে একেবারে পাগলের ন্যায় হয়ে গেল। দলিয়া আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে গেল। সে বল্‌তে লাগল, দুনিয়ার সবই রহস্যপূর্ণ। কেউ সন্তানকে জীবন্ত কবরে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, আবার কেউ একটি সন্তানের জন্য জীবন্মৃত হয়ে থাকে! এ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পর, একদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে—দলিয়ার শয়নকক্ষে গিয়ে দেখলুম, দলিয়ার দেহ হতে প্রাণবায়ু বাহির হয়ে গিয়েছে! তা'র হাতের লেখা একখানা চিঠি—শয্যায় পড়েছিল, তা পাঠ করে জান্‌লুম, সে বিষ খেয়ে সকল যন্ত্রণার অবসান করেছে। সে হ'তে বাদসা সাহেব! মতিয়া আপনার কন্যা হলেও,—কন্যা-স্নেহে তা'কে আমি প্রতিপালন করে এত বড় করে তুলেছি। সাহাজাদার সাথে তা'র বিয়ে অসম্ভব, তাই আমি এতদিন সে কথাই বলে আস্‌ছিলুম,—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে, এ বিবাহে বাধা দিতে চেষ্টা করেছি। স্নেহের আতিশয্যে আমি যা করেছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। মতিয়া আজ আর আমার কন্যা নয়,—বাদসার কন্যা,—রাজ্যের আংশিক অধিকারিণী" বলিয়া কাজী সাহেব বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র আচ্ছাদন করিয়া, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

কাজী সাহেবের উক্তি শ্রবণ করিয়া, বাদসা সাহেবের অন্তরে, ভীষণ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গেল। এক অপ্রত্যাশিত বিবেক আলোড়নের প্রেরণায়, তাঁহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া, আবার নূতন করিয়া গঠিত করিয়া দিল। এক গুরুভারাতুর, অথচ অনুপায় হেতু ক্ষোভে জর্জ্জরিত হৃদয় মন লইয়া, তিনি অসীম অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। বাদসা সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত

নীরবে বসিয়া থাকিয়া, জড়িতকণ্ঠে বলিলেন "কাজী সাহেব! এ সমস্ত ব্যাপার সবই যে আমার নিকট হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে।"

কাজী সাহেব—কথায় বাধা প্রদান করিয়া, শান্ত ও স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! হেঁয়ালির কিছুই নেই এর ভিতর, সবই সত্য,— খাঁটি সত্য। এই দেখুন—দলিয়ার স্বহস্তের লিখিত শেষ চিঠি,—এ লেখা আপনার হয়-ত খুবই পরিচিত। এ চিঠি পাঠ কর্‌লেই, আপনার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যাবে।" বলিয়া কাজী সাহেব, স্বীয় জামার পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, বাদসা সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন।

বাদসা সাহেব আগ্রহাতিশয্যে চিঠিখানা গ্রহণ করিলেন এবং পর মুহূর্ত্তে পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"মামু! আপনার সাহায্য না পেলে, আজ আমি বাদসার "স্মৃতিচিহ্নটুকুন" জীবিতাবস্থায়,—পৃথিবীতে রেখে যেতে পার্‌তুম না। কবরে,—আমার বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, এও নষ্ট হয়ে যেত! তজ্জন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলুম। কন্যার নাম "মতিয়া" রেখে গেলুম,—আপনিও মতিয়া নামে, এ-কে পরিচিত কর্‌বেন। আপনি নিঃসন্তান, আপনাদের শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ের বিয়োগ-ব্যথা মুছে ফেল্‌বার অভিপ্রায়ে, আজ আমি মতিয়াকে, আপনাদের হস্তে অর্পণ করে গেলুম। কন্যা-স্নেহে, আপনারা মতিয়াকে প্রতিপালন কর্‌বেন। মতিয়ার জন্মবৃত্তান্ত কাউকে জান্‌তে দিবেন না,—এই আমার শেষ প্রার্থনা। যদি ঘটনাচক্রে,—এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ান, যে সময় মতিয়ার খাঁটি পরিচয় প্রদান না করে,—তা'কে রক্ষা কর্‌বার, আর কোনই উপায় থাকবে না,—সেই সময়ই কেবল, তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ কর্‌বেন,—নইলে নয়। জীবনে অনেক আশাই করেছিলুম,—

অনেক আশাই বুকে নিয়ে, সুখের সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, কপাল দোষে, সবই অপূর্ণ রয়ে গেল। আমি নিজহাতে বিষ খেয়েছি, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়! এমনিভাবে যে আমাকে জীবন বিসর্জ্জন কত্তে হবে, 'তা' স্বপ্নেও ভাবি-নি! যে স্ত্রীলোক স্বামীর আদরে বঞ্চিতা,—তার মৃত্যু, সহস্রবার বাঞ্ছনীয়! মৃত্যু সময় স্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ কত্তে পারলুম না,—এ খেদ মনে থেকে গেল! ক্ষমা করবেন,—বিদায়।"

আপনার স্নেহের ভাগিনী,

দলিয়া।

পত্র পাঠ করিয়া বাদসা সাহেব একেবারে মুস্‌ড়িয়া পড়িলেন। মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে তিনি একান্ত বিস্ময়াহত ও স্তম্ভিত-প্রায় হইয়া পড়িলেন। একটা প্রবল হাহাকারে, তাঁহার সমস্ত অন্তর মথিত হইতে লাগিল। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করিলেন। দলিয়ার স্মৃতি,—ধ্যান ও ধারণার প্রবল উন্মেষণার ভিতর দিয়া, তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া, তাঁহার বাসনার ও কামনার মোহ-গন্ধ, পীযূষধারাবৎ, শরীরের শোণিত-শিরায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাদসা সাহেব উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া পার্শ্বের কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলেন। শেষে পরম সোহাগে, মতিয়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া,—স্বীয় আসনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি মতিয়ার মুখের উপর স্নেহ-দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া বলিলেন "মতিয়া! মা—আমার, আমাকে ক্ষমা কর, আমি না জেনে, তোমাকে কত কষ্টই-না দিয়েছি। বাদসার কন্যা হয়ে, তুমি যেভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিলে, তা' মনে করলে, আপনাকে বাদসা বলে পরিচয় দিতে

ঘৃণাবোধ কচ্ছি। মা! আমাকে ক্ষমা করো! পিতার শত অপরাধ, ক্ষমা কত্তেই হ'বে তোমাকে।"

মতিয়া কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া, পিতার বক্ষে মস্তক লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কন্যা ও পিতার নীরব ক্রন্দনের ভিতর, কত গূঢ় রহস্য ও স্নেহের কত বড় উচ্ছ্বাস যে নিহিত ছিল, তাহার পরিমাপ করা নিতান্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত। এ ভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়া বাদসা সাহেব আপনাকে অনেকটা সামলাইয়া লইলেন। আবার পিতা ও কন্যার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সাহাজাদা এতক্ষণ নীরবে বসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অন্তরের ভাব একেবারে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে বহুদিন পূর্ব্বে মতিয়াকে, কাজী সাহেবের বাঁধান ঘাটে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিয়াছিল। আজ মতিয়াকে, সে এক নূতন ভাবে অবলোকন করিয়া,—ভ্রাতার স্নেহ-পীযূষধারায় তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া ফেলিল। এ কি অভিনব পরিবর্ত্তন! পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের অসীম চাঞ্চল্য,—মন হইতে এক মুহূর্ত্তে বিদায় করিয়া দিয়া, এক অসীম স্বর্গীয় ভাবের স্ফুরণের ভিতর দিয়া, সাহাজাদা—মতিয়াকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না! ইহাই মানুষের স্বাভাবিক স্ফুরণ,—ইহাকেই বলে একই রক্তের,—অসীম আকর্ষণ!

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল, নানা কথা প্রসঙ্গে, অতিবাহিত করিয়া বাদসা সাহেব বলিলেন "কাজী সাহেব! যে ব্যক্তি আপনাকে মতিয়া ও হোসেনের সংবাদ জ্ঞাত করিয়াছিল, তা'র নাম আমাকে জানতে হবে। সে আমার যে উপকার করেছে,—তার প্রতিদান হয় না। যদি গোপনে বিবাহ কার্য্য শেষ হয়ে যে'ত—তা হলে কত বড়

গুরুতর অভাবনীয় কার্য্যের যে অনুষ্ঠান হ'ত—তা ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে! তা'কে আমি বিশেষভাবে পুরস্কৃত করব, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি!"

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন "খোদাবন্দ! যে এ সংবাদ প্রেরণ করেছে, সে আপনার প্রাসাদে আজ বন্দী। তা'র নাম—আমিনা।"

আমিনার নাম শ্রবণ করিয়া বাদসা সাহেব সবিস্ময় শ্রদ্ধাতিশয্যে একেবারে গম্ভীর হইয়া গেলেন। দারুণ মনস্তাপে তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলে বজ্রসূঁচী বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি ক্ষোভ-কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "কাজী সাহেব! আমিনা আপনার কি হয়।"

কাজী সাহেব বিনীতকণ্ঠে বলিলেন "আমিনা আমার পালিতা কন্যা—বাল-বিধবা, আমি তা'র একমাত্র অবলম্বন। মতিয়া ও হোসেন অপহৃত হ'বার পরদিনই,—সে গোপনে আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে, আপনার অন্দরে প্রবেশ করেছে। মতিয়া ও হোসেনকে উদ্ধার কর্‌বার উদ্দেশ্যেই, হয়-ত সে আপনার প্রাসাদে বাস কচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টায়ও এতদিন তা'র সন্ধান কত্তে পারি-নি। কাল তা'র একখানা চিঠি পেয়ে আমি সমস্ত অবস্থা অবগত হয়েছি।"

বাদসা সাহেব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং মতিয়াকে কাজী সাহেবের সহিত অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া, অসীম খেদের সহিত বলিলেন "হায়! এ প্রসঙ্গে আমি কত অশুভ অনুষ্ঠানেরই না সহায়তা করেছি! আমি এ মুহূর্ত্তেই আমিনাকে,—স্বহস্তে মুক্ত করে দিচ্ছি।" বলিয়া বাদসা সাহেব আমিনার কারাকক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন।



বিংশ পরিচ্ছেদ ।

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। বাদসা সাহেব আমিনার কারাকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং দৃষ্টি ঘুরাইতেই দেখিতে পাইলেন, আমিনা নীরবে একটী উন্মুক্ত গবাক্ষ-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, উদাস-দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার সুগৌর আননে, ক্ষোভ ও বিরক্তির একটা ম্লান ছায়া স্পষ্ট প্রতিভাত। তাহার ভাব-সমুদ্রে কি তরঙ্গ ভঙ্গ হইতেছিল,—তাহা সেই জানে,...তবে তাহার মুখে চোখে একটা বিজাতীয় ক্রোধ-বহ্নির পরিস্ফুট আভা যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল।

বাদসা সাহেব, সম্মুখীন হইয়া, তাহার তীক্ষ্ণ ও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি, আমিনার মুখের উপর সংন্যস্ত করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, দ্বিধা ও কুণ্ঠা-বিরহিত-কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন "আমিনা!"

আমিনা বাদসার আহ্বানে চমকিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি তাহার বিস্রস্ত-বসন সংযত করিয়া, নৈরাশ্য-ভীত-ম্লানমুখে বাদসার প্রতি নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া দৃষ্টি আনত করিল। শেষে নিতান্ত সহজভাবে, পূর্ব্বের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইতে লাগিল।

বাদসা সাহেব আমিনার নির্লিপ্ত আচরণে অনেকটা অস্বস্তি অনুভব করিলেন। তিনি পার্শ্বের আসনে উপবেশন করিয়া, নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন "আমিনা! আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি, তুমি এখন আর বন্দী নও,—এখন তুমি স্বাধীন ও মুক্ত।"

শরীরের কোন স্থানে একটা কাঁটা ফুটিলে, যেমন খিচ্‌খিচ্‌ করে বাদসার কথাগুলি যেন ঠিক তেম্‌নিভাবে তাহার প্রাণের ভিতর অস্বস্তি দিতে লাগিল। তাহার মর্ম্ম-যেন একটা বিষাক্ত তীরের আঘাতে, বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে চাহিল। আমিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এবং পরিহাসের সহিত তীব্রকণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! আমি-ত আপনার নিকট মুক্তি ভিক্ষার প্রার্থী নই। মানুষের অন্তর চিরদিনই মুক্ত,—বাহ্যিক বন্ধনের অসীম তাড়নে,—তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে না! আমি এই রুদ্ধ কারাকক্ষে বসে, আমার মনকে নিয়ে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছি। উন্মুক্ত চিন্তা-তরঙ্গে,—আমার মন আলোড়িত হচ্ছে,—এর প্রতিরোধ কর্‌বার শক্তি আপনার আছে? আমি যেদিন আপনার অন্দরে প্রবেশ করেছি,—সেদিনই, আমি স্বইচ্ছায় বন্দী সেজেছি। খোদা যেদিন মুক্তি দিবেন, সেদিনই মুক্ত হব? আমাকে মুক্তি দিবার আপনি কে? তবে—কক্ষের বাইরে স্বাধীনভাবে চল্‌বার কথা বল্‌ছেন,—তা' স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ স্বাধীনতা কোন দিনই বাঞ্ছনীয় নয়,—তা'তে বিপদের আশঙ্কাই যথেষ্ট।"

বাদসা সাহেব প্রত্যুত্তরে ঈষৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, তখনই আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি সবেগে বলিলেন—সেরূপ কিছু বলার উদ্দেশ্য আমার নেই। তোমাকে অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায়—চলাফেরার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে আমি

এসেছি। আমিনা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি না বুঝে, তোমাকে বন্দী করেছিলুম---তজ্জন্য আমি খুবই অনুতপ্ত হয়েছি।"

বাদসার উক্তিতে আমিনার অন্তর অসীম উত্তেজনায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার আননে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ভ্রুকুটিবদ্ধ নেত্রে, বাদসার প্রতি তাকাইয়া বলিল "ক্ষমা! ক্ষমা কর্‌বার আমি কে বাদসা সাহেব? আমি বাঁদা, তা'র বেশী কিছু নই। বাদসার যিনি বাদসা, একমাত্র তিনিই আপনার ক্ষমা কর্ত্তে পারেন। একটা অসহায়া স্ত্রীলোককে বন্দী করে, আপনি হয়-ত, আত্ম-শক্তি স্ফুরণের পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন,—কিন্তু আমার মনে হয়,—আপনার এ সমস্ত তৎপরতা, আপনার কাপুরুষতারই পরিচায়ক।"

বাদসা সাহেব আমিনার পরিহাস উক্তির তীক্ষ্ণ-বাণে,—এতটুকু বিচলিত হইলেন না। আমিনার স্থির ধীর গাম্ভীর্য্য ও অকুতোভয়তা, তাঁহার চিত্তে যেন একটা বিস্ময়ের প্রলেপ লেপিয়া দিল। বাদসা সাহেব নিতান্ত সহজভাবে বলিলেন "আমিনা! আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি। তুমি শত বাক্যবাণে জর্জ্জরিত কর্‌লেও—আমি তোমাকে প্রীতির চক্ষেই দেখ্‌ব।"

আমিনা অবাক-বিস্ময়ে বাদসার প্রতি তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—আমার প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করেছে? সে আবার কিসে সম্ভবপর হ'তে পারে? দৌলত আমার অনেকটা পরিচয় পেয়েছে। দৌলত বাদসাকে সব প্রকাশ করে দিয়েছে? না—তা' হতে পারে না। প্রকাশ্যে বলিল "বাদসা সাহেব! আমি ক্ষুদ্র নারী, আশ্রয়হীন, আমার কি পরিচয় আপনি সংগ্রহ করেছেন?"

বাদসা সাহেব শান্ত ও সংযতস্বরে, কাজী সাহেবের উক্তির সার অংশ, সরলভাবে বিবৃত করিলেন। হোসেনের সহিত মতিয়ার বিবাহ দিতে তিনি যে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন, তাহাও জানাইয়া দিলেন।

বাদসার উক্তিতে, আমিনার শরীরের মধ্যে,—অকস্মাৎ যেন একটা আনন্দের শিহরণ,—তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গেল। বিজয়পূর্ণ আনন্দের একটা উৎকট হর্ষচ্ছটায় আমিনার আশাহত মলিন মুখ,—সুখোদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা একটা গভীর দুর্ভেদ্য রহস্যের মতই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে মৃদুমন্দ হাসির ছটায়,—মরকত-মণিপ্রভ-আরক্ত-অধর রঞ্জিত করিয়া, সকৌতুকে উত্তর করিল "বাদসা সাহেব! খোদার ইচ্ছায়—অসম্ভব ব্যাপারও বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে,—তিনি তাঁহার নিপুণ করস্পর্শে, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অস্বস্তি ও অশান্তির অবসান করে দিলেন। আমার পরিচয় আপনি পেয়েছেন,—হয়-ত এই আত্মগোপনের প্রসঙ্গ নিয়ে আপনি আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু বাদসা সাহেব! আজ আমার প্রাণে যে তৃপ্তির সঞ্চার হয়েছে, তার তুলনা জগতে নেই। আমি যে মহামন্ত্র উদযাপনের জন্য নিজকে অসীম বিপদ-সঙ্কুল পথে ফেলে দিয়েছিলুম,—তার পশ্চাতে গভীর স্নেহের স্ফুরণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আজ আমার তৎপরতা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে, খোদাকে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অবসর গ্রহণ কচ্ছি। আমি ক্ষুদ্র নারী,—আপনাকে খুবই প্রতারণা করেছি,—তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, বাদসা সাহেব, আবেগ মথিতকণ্ঠে বলিলেন "আমিনা! তুমি যা' করেছ, তার তুলনা হয় না। তোমার বুদ্ধি ও কার্য্যতৎপরতার ফলে, আজ একটা অন্যায় অনুষ্ঠানের পথ হ'তে, আমি নিজকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। তুমি কৌশলে,

গোপনে, সমস্ত বিষয় কাজী সাহেবকে না জানালে,—চারিটী প্রাণী একেবারে অশান্তি-জালে আচ্ছন্ন হ'ত। খোদার ইচ্ছায় সকল ঝঞ্ঝাট কেটে গেছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত কত্তে চাই।"

আমিনা অঞ্জলিবদ্ধা থাকিয়া প্রসন্ন-স্মিতকণ্ঠে বলিল "খোদাবন্দ! আমি পুরস্কৃত হবার মত কোন কাজ করি-নি.। ন্যায়ের পথে প্রাণপণে যুদ্ধ কত্তে চেষ্টা করেছি। আমি বাল-বিধবা, ভিখারিণী। ধন, দৌলত পুরস্কারের প্রার্থী আমি নই। খোদার নিকট প্রার্থনা করবেন,—আমার অবশিষ্ট জীবন, পরের কাজে যেন নিয়োজিত কত্তে পারি।"

বাদসা সাহেব মুগ্ধদৃষ্টিতে আমিনার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "আমিনা! আমি পুরস্কারস্বরূপ কোন ধন, দৌলত দিতে আসি-নি। আমার অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—প্রণয়, তাই তোমাকে পুরস্কার দিব। তুমি আমার বেগম হয়ে আমাকে আজীবন তৃপ্ত কর।"

আমিনা বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া সহসা আসন ত্যাগ করিল এবং কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইয়া, বাদসার প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল "বাদসা সাহেব! আপনি ভুল বুঝেছেন,—আমি কার্য্যোদ্ধারের জন্যই আপনাকে মিথ্যা প্রতারণা করেছি। বেগম হবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার অন্দরে প্রবেশ করি-নি। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। আমি এখন প্রত্যাবর্ত্তন কত্তে প্রস্তুত হয়েছি। বেগম হবার ক্ষমতা আমার নেই,—আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখ-সম্ভোগের অতুলনীয় চিত্র,—আমাকে মুগ্ধ করতে পারবে না।"

বাদসা সাহেব বিস্ময়ভরে বলিলেন "তুমি বাল-বিধবা। পরের আশ্রয়ে, বাঁদীর মতই দিন গুজরাণ কচ্ছ। বেগম হবার সাধ তোমার

হয় না? স্বামীর ঘর কর্‌বার ইচ্ছা কি তোমার অন্তরে স্থান পেতে চায় না? তুমি যুবতী—এ বয়সে এম্‌নিভাবে, সর্ব্বত্যাগী হয়ে, শান্তির সন্ধান-ত কোন দিনই পাবে না,—পদস্খলন অনিবার্য্য!"

বাদসার প্রেমোৎফুল্ল চিত্তের সাগ্রহ-অভিনন্দনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া,—আমিনা সগর্ব্বে বলিল "আপনি ভুল বুঝেছেন। আমার স্বামী আছেন,—অন্ততঃ আমি একজনকে স্বামী নির্ব্বাচন করে, তাঁর ছবি অন্তরে অঙ্কিত করে রেখেছি। অতি শৈশবে বৈধব্য-দশা ঘটেছে,—স্বামী যে কি তা' জান্‌বার মত অবস্থা আমার ছিল না। যৌবনে পদার্পণ করে,—ক্ষুধার্ত্ত চিত্ত নিয়ে, যখন আজীবনের সাথী কর্‌বার মত লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম,—তখন এক শুভ মুহূর্ত্তে আমার উপাস্য আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে তাঁর চরণে বিলিয়ে দিয়েছি,—আমি এখন তাঁরই! বেগম হবার অধিকার-ত আমার নেই। সেই উপাস্য দেবতার কাজেই আমি আপনার অন্দরে প্রবেশ করেছিলুম,—কার্য্য শেষ হয়ে গেছে,—এখন আপনার নিকট বিদায় প্রার্থনা কচ্ছি।"

বাদসা সাহেব একান্ত আশ্চর্য্যদৃষ্টিতে, আমিনার আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত গম্ভীর মুখের প্রতি তাকাইয়া, নিতান্ত আহতচিত্তে, জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"কে সে ভাগ্যবান্ পুরুষ—আমিনা!"

আমিনা মাথা নত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বিবর্ণমুখে ঈষৎ লজ্জার একটা আরক্ত আভা ক্ষীণ-ধারে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। আমিনা জড়িতকণ্ঠে বলিল "খোদাবন্দ! আমি হোসেন আলীর মা—ওস্তাদজীই আমার হৃদয়-দেবতা।" বলিয়াই আমিনা দ্রুতপদবিক্ষেপে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমিনা কয়েক মিনিটের মধ্যে মতিয়ার সহিত মিলিত হইল। মতিয়া স্মিতমুখে আমিনার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, তাহার বুকে মাথা গুঁজিল। শেষে অনেকটা আশ্বস্থ হইয়া,—মতিয়া সহজ ও সরল ভঙ্গিতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

আমিনা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিল, এবং মতিয়ার মুখখানা সাগ্রহে তুলিয়া, অজস্র চুম্বনধারায় অভিষিক্ত করিল।---ঠিক এম্‌নি সময়ে সাহাজাদা তথায় উপস্থিত হইয়া উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বলিলেন "মতিয়া! বোন্‌! দিদি আমার! ইনি কে আমাদের? আমি-ত কখনও একে দেখি-নি,—চিন্‌তে পারলুম না।"

মতিয়া একগাল হাসিয়া,—সাহাজাদাকে আমিনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিল। সাহাজাদা সসম্ভ্রমে আমিনাকে অভিবাদন করিয়া,—একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

আমিনা সাহাজাদাকে প্রত্যভিবাদন জানাইয়া, ব্যস্ততার সহিত বলিল "সাহাজাদা! খোদা আমাদের করুণ-রোদন শুনে, সকল উদ্বেগের অবসান করে দিয়েছেন। আপনি যদি জান্‌তে চেষ্টা কত্তেন—ভালবাসার কতটুকুন উদ্বেলিতধারা বুকে করে, দৌলৎ

আপনাকে আমরণ সাথী কত্তে চেয়েছিল,—তা' হ'লে আপনি তা'কে এমনি তাচ্ছিল্যভবে, তা'র বরণ-ডালা, প্রত্যাহার কত্তে চাইতেন না। যাক্ সে কথা,—দৌলতকে এ শুভ সংবাদ জানিয়েছেন কি সাহাজাদা ?"

প্রশ্ন শুনিয়া, অনুতাপের তীব্র তিরস্কার যেন, একগাছা কাঁটার চাবুকের মতই, কষাঘাতে, সাহাজাদার বুকের পাঁজরগুলি ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। সাহাজাদা মস্তক নত করিয়া বলিলেন "না,—মস্ত ভুল হয়ে গেছে।"

আমিনা গম্ভীরস্বরে বলিল "সাহাজাদা ! আপনি এ মুহূর্ত্তেই দৌলতের কাছে যান্। তার অশান্ত হৃদয়ে, শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে আসুন। দৌলতের মত পত্নী লাভ,—যা'র ভাগ্যে ঘটে, তিনি বাস্তবিকই ভাগ্যবান্।"

সাহাজাদা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, ত্বরিতপদে দৌলতের শয়নকক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কক্ষের দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। ভিতর হইতেই অর্গল বদ্ধ ! সাহাজাদা কয়েকবার দৌলতকে ডাকিলেন, কোনই প্রত্যুত্তর পাইলেন না। একটা অসীম বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার শরীর দিয়া, একটা প্রবল কম্পন বহিতে লাগিল। তিনি শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র জড় করিয়া, কপাটে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। উপর্য্যোপরি প্রচণ্ড আঘাতের ফলে, অর্গল ভাঙ্গিয়া, দ্বার মুক্ত হইয়া গেল।

সাহাজাদা উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে, দৌলতের শয্যা পার্শ্বে যাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। শয্যার উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিতেই দেখিলেন,—তাঁহার বাঞ্ছিতা, সম্পদস্বরূপা,—মোহিনী-নারী—দৌলৎ,—দলিত পুষ্পমাল্যের মতই মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ভ্রমরলাঞ্ছিত কৃষ্ণ কেশপাশ, রুক্ষ ও অযত্ন শিথিল। তাহার

চারুদেহ—ভূষণ মাত্র হীন! তাহার অধরে স্বাভাবিক রক্তরাগটুকু,—পাটল পুষ্পের মতই বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস, মৃদুমন্দ ভাবেই প্রবাহিত হইতেছিল।

সাহাজাদা একেবারে উন্মত্ত অধীরের মতই শয্যায় যাইয়া বসিলেন,—এবং দৌলতের মস্তক তাহার ক্রোড়ে সযত্নে রক্ষা করিয়া, অবস্থা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।—সাহাজাদার নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুক চিঁড়িয়া, কণ্ঠ ঠেলিয়া, একটা অব্যক্ত আর্ত্তধ্বনি মুহুর্মুহুঃ আপনাকে ছিটকাইয়া, ফাটাইয়া দিবার জন্য, তাহার অন্তরটাকে নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন করিতে লাগিল। সাহাজাদা শয্যায় দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া দেখিলেন,—দৌলতের লিখিত একখানা পত্র, সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। সাহাজাদা হস্ত প্রসারণ করিয়া, পত্রখানা তুলিয়া লইলেন। ব্যগ্রতাতিশয্যে পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন।

সাহাজাদা! প্রিয়তম,—

আত্মহত্যা মহাপাপ,······তা' জেনেও, আজ আমাকে তা'রি আশ্রয় নিতে হল! আমার অন্তরে,—যে বিষয়ের বীজ ছড়ান রয়েছে, তা'র সংঘাতে অতিষ্ঠ হয়েই, এম্নি করে আজ বিদায় নিতে বসেছি।

প্রাণের অসহ্য দুঃখ জানাব বলেই,—সেদিন তোমার আশ্রয় নিয়েছিলুম,—তোমারই চরণে, নিতান্ত অসহায়ের মত লুটে পড়েছিলুম! তুমি-ত আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! বিনিময়ে,—তোমার নিকট হ'তে পেলুম,—যা' স্বপ্নের অতীত ছিল,—সেই প্রত্যাখ্যান!···আর অপ্রত্যাশিত নির্ম্মম ভর্ৎসনা।—তুমিই জানিয়ে দিলে,—আমার মরণে তোমার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই! সেই উক্তির প্রেরণায়,—আমি মরণ পথে ছুটবার জন্য বিদ্রোহী হয়েছিলুম! তুমি মমতে অনুমতি

দিয়েছিলে, তোমার অনুমতি নিয়েই আজ মরতে বসেছি,—দোষগুণ বিচারের প্রয়োজন-ত আমার নেই!

এতদিন আগুনের হল্‌কা বুকে করে, সুদীর্ঘ মুহূর্তগুলি কাটিয়ে দিয়েছি। মরণ বরণ কর্‌বার কত কি পথ খুঁজে বেড়িয়েছি,—কোনটাই মনঃপূত হয় নি। তুমি আমাকে না চাইলেও, আমি তোমার আশা একেবারে ছেড়ে দিতে পারি নি, তাই তোমাকে ফেলে অচিন দেশে বিদায় নিতে এতদিন ইচ্ছা হয় নি! ভোরে যখন শুন্‌লুম, মতিয়ার সাথে আজই তোমার বিয়ে হবে, এবং আমার বিয়ে আগামী কল্য সম্পন্ন করাবে,—তখন আমি, আশার শেষ ক্ষীণ আভাটুকু মন হতে মুছে ফেল্‌তে বাধ্য হলেম! তাই আজ বিষ সংগ্রহ করে,—আমার অস্তিত্ব লোপ কত্তে বসেছি!

আমি তোমার পরিত্যক্তা,—তুমি আমার কেউ নও,—একথা ভাব্‌তেও আমার বুক ভেঙ্গে যেতে চাচ্ছিল। তোমাকে ছেড়ে আর কেউকে পতিরূপে বরণ কত্তে হবে, একথা চিন্তা কত্তেও, আমার অন্তর শতধা হয়ে ছিন্ন হতে চাচ্ছিল। যা কখনও ভাবিনি, যা ঈপ্সিত নয়, সে অবস্থা বরণ করে, কৃত্রিম অভিনয় কত্তে, যেটুকুন শক্তির প্রয়োজন, তা'ত আমার নেই! শৈশব হ'তে তোমাকেই চিনেছিলুম, তোমাকেই চেয়েছিলুম, তোমাকে পাব না,—এত বড় অভিসম্পাত বরণ করার মত শক্তি সঞ্চয় কর্‌বার জন্ত-ত প্রস্তুত ছিলুম না।

নারী সব ত্যাগ কর্‌তে পারে,—কিন্তু মনমাতানো পবিত্র ভালবাসার স্মৃতিটুকুন বিসর্জ্জন দিয়ে, আবার নূতনভাবে মন গড়ে নিতে পারে না! যদি সেরূপ কত্তে চেষ্টা করে তবে সে নিজে-ত পুড়ে মরেই, বিনা দোষে অপরকেও পুড়িয়ে মারে! এ-ত তুমি বুঝলে না, বুঝতেও চাইলে না। যদি কোনদিন, এ অভাগিনীকে স্মরণ করে, একটা

দীর্ঘশ্বাসও তার জন্য ফেল্‌তে চাও, তবে মনে রেখো, সে দীর্ঘশ্বাসটুকুনই আশীর্ব্বাদরূপে, আমাকে পরপারে শান্তি দিবে!

আজ মৃত্যুক্ষণে বল্‌ছি,—তুমি আমারি ছিলে,—আজ পর্য্যন্ত আমারি আছ, আমার মৃত্যুর পরও আমি তোমারি থাক্‌ব। তুমি আমারি, এ স্মৃতি নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি,—কাল, বিয়ের পর, সে সৌভাগ্য হয়-ত আমার ঘটে উঠ্‌বে না। কাল হয়-ত আমি অপরের হব,—তোমার ছায়া চিন্তাটুকুও ঘোর পাপ পঙ্কে ডুব্‌বার একটা মস্ত উপাদান আখ্যা দিয়ে,—নরকের দিকে টেনে নিতে চাইবে; তাই আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে বিদায় নিতে চাইছি। অনেক লিখ্‌বার ছিল,—লিখ্‌বার শক্তি-ত আর নেই, সবই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, শত অপরাধ ভুলে, আমাকে ক্ষমা করো, তবে যাই। এ জন্মের মত বিদায়!"

হতভাগিনী—
দৌলতন্নেছা।

পত্র পাঠ করিয়া সাহাজাদা একেবারে উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। দৌলতের মুখের উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া অশ্রুর বাঁধ মুক্ত করিয়া দিলেন! শেষে অসীম অমঙ্গল চিন্তায়, উচ্ছ্বসিত হইয়া, বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্দরের প্রায় সকলেই আসিয়া, কক্ষ মধ্যে জড় হইল। প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া, সকলেই অসীম অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। বাদসা সাহেব "হেকিম" আনাইবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং দৌলতের শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। বেগম সাহেবা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, দৌলতের

সংজ্ঞাহীন দেহ বক্ষে টানিয়া লইয়া, অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে, অন্দরের ছোট, বড় সকলেরই মুখে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "হেকিম" সৈয়দ আফজল, দৌলতন্নেছার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি একজন বহুদর্শী ও সুচিকিৎসক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। তিনি যন্ত্রের সাহায্যে, দৌলতের পাকস্থলী সঞ্চিত সমুদয় পদার্থই বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহাতে বিষের অংশ নাই। প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বিষপান করিয়াছিল বলিয়া, বিষের সমস্ত অংশই রক্তপ্রবাহে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন! তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, বিষের ক্রিয়া নষ্ট করাইবার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার নৈরাশ্য ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, সকলেই অসীম অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে সারা বাড়ীটা যেন ঘোর বিষাদ-মেঘে আবৃত হইয়া গেল, সকলের মুখেই যেন অমঙ্গল চিন্তার বিষাদ-কালিমা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

বাদসা সাহেব ভীতিসন্ত্রস্তনয়নে, উন্মত্তের ন্যায় হেকিম সাহেবের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "হেকিম সাহেব! দৌলতকে বাঁচিয়ে দিন,

যা' চাইবেন, তাই পুরস্কার দোব। দৌলতের উপর খুবই অত্যাচার হ'য়েছে, এম্‌নিভাবে যে তারি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হ'বে, তা'ত কোনদিনই ধারণা কত্তে পারি-নি।"

হেকিম সাহেব একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! খুবই দেরী হ'য়ে গেছে,—যদি আরও এক ঘণ্টা পূর্ব্বে চিকিৎসার ভার নিতে পাত্তুম, তবে অবস্থাটা এত খারাপ হ'তে পাত্ত না। আমার সাধ্যমত চেষ্টা কচ্ছি, খোদার নিকট প্রার্থনা করেন, তাঁর হাতেই সকল নির্ভর কচ্ছে।"

বাদসা সাহেব হেকিম সাহেবের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। একটা অভাবনীয় আশঙ্কায়, তাঁহার মূর্ত্তি শুষ্ক, রুক্ষ ও অপ্রকৃতিস্থের ভাব ধারণ করিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে, হাস্যস্ফুরিতধরা সদা আনন্দময়ী দৌলতের মুখমণ্ডল আশ্চর্য্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, এক ভীতিপ্রদ ভাব ধারণ করিল। নিষ্ঠুর যমের দণ্ড স্পর্শে, যেন তাহার সমস্তই চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

শরীরের ভিতর খুব একটা ক্ষত পরিপুষ্টি লাভ করিলে, তাহার তড়াসে সমস্ত দেহটা যেমন আড়ষ্ট হইয়া যায়, সাহাজাদার বুকের ভিতরকার আহত বেদনায় তাহাকে তেম্‌নিভাবে, আরও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। শব-বিবর্ণমুখে, থরথর কম্পিত দেহে, সাহাজাদা দৌলতের শয্যাপার্শ্বে, নীরবে উপবেশন করিয়া, আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিষাক্ত বাণের ফলাবিদ্ধ পাখীর ন্যায়, অসীম অনুশোচনায়, তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। দৌলতের জীবন-প্রদীপ বুঝি এক ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, এই অসীম আশঙ্কা লইয়া, অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল!

সে একমনে ভাবিতে লাগিল, দৌলতের মৃত্যু ঘট্‌লে, এর জন্য কে দায়ী হ'বে? দৌলত!—তা'ত হতে পারে না,—আমিই হ'ব তা'র হত্যাকারী! আমার নির্ম্মম ব্যবহারই তা'কে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। অন্তরের অসীম যন্ত্রণার অবসান কর্‌বার জন্যই, দৌলত এই শেষ পন্থা অবলম্বন করেছে! এই মৃত্যু বরণ কর্‌বার আগ্রহের ভিতর, তা'র অন্তরের কত বড়,—স্নেহের জাগ্রত ভাবের সাড়া এনে দিচ্ছে, তা' অনুভব কর্ত্তে চেষ্টা কর্‌লেও বুক ফেটে যেতে চায়! অন্তরের অন্তস্থলে ভালবাসার স্ফুরণ পোষণ করে, দৌলত আমারি হ'তে চেয়েছিল, আমি-ত তা হ'তে দি'নি! হায়! আমার অন্তর যে কত বড় কঠিন, পাষাণে গড়া, তা'র হিসাব যখন সে করেছে, তখন হয়-ত তা'র অন্তর একটা অসীম ধিক্কারে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল! দৌলত! তুমি মরো না, আমায় ছেড়ে যেয়ো না, আর কখনও তোমাকে অবজ্ঞা করব না, কখনও তোমাকে ত্যাগ কর্‌বার সঙ্কল্প কর্‌ব না, তুমি-ত ক্ষমাশীল, আমাকে ক্ষমা কর্‌বে না? এত বড় কঠিন শাস্তির বিধান কর্‌বে? যদি তাই কর্ত্তে চাও,—তবে এত বড় আঘাত সহ্য কর্‌বার শক্তি যে আমার নেই! আমি যে খুনী,—ডাকাতের নরহত্যার চেয়েও অনেক বেশী পাপী! নরকেও-ত আমার স্থান হ'বে না! সাহাজাদা অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া শয্যার একপার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল! রোদনের বেগ সংবরণ করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পশ্চিম আকাশ রক্তরাঙা হইয়া, সূর্য্যদেবের বিদায় বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। এম্‌নি সময়ে দৌলতের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষুর তারকা যেন

কেমন হইয়া গেল! সাহাজাদা ভীতিবিহ্বলচিত্তে, মরণোন্মুখ দৌলতের মস্তক স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিয়া, অনিমেষে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। হেকিম সাহেব দৌলতের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন! শেষে অশ্রুসিক্ত নয়নে, ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তৈলহীন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন পূর্ণ তেজে একবার জলিয়া উঠে,—দৌলতও সেইরূপ চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইল না, তাহার পর সাহাজাদার ক্রোড়েই চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল!

সব ফুরাইল,—এক মুহূর্ত্তে সব শেষ হইয়া গেল। অসীম বিলাপ-ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইল! বাদসার আনন্দধামে সহসা অসীম হাহাকার রব উত্থিত হইতে লাগিল। অতঃপর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে, প্রাসাদের সংলগ্ন ক্ষুদ্র নদীর ধারে, দৌলতের দেহ "কবরে" সমাহিত করিল। বাদসা সাহেব সাহাজাদার অর্দ্ধ সংজ্ঞাহীন দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া যখন প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন ঘড়িতে তিনটা বাজিয়াছিল।

ইহার পর তিনটি দিন কাটিয়া গিয়াছে! মধ্যরাত্রি, সমস্ত চরাচর তমসাচ্ছন্ন। গভীর নৈশ নীরবতার মধ্যে বর্ষাবারি পরিপূর্ণাঙ্গী ক্ষুদ্র নদীটির অশ্রান্ত কলরোল যেন, একটা মর্ম্ম বিদারক অস্ফুট রোদনের মতই করুণ বোধ হইতেছিল। তীরের বটবৃক্ষে, উৎকট ধ্বনিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকা তান তুলিয়াছিল। এম্নি সময়ে সাহাজাদা, সকলের অজ্ঞাতসারে, নিঃশব্দে তাহার শয়ন কক্ষ হইতে পলায়ন করিয়া, দৌলতের কবরের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। মেঘের পর মেঘ,

ভাসিয়া ভাসিয়া, আকাশপ্রান্তে, জমাট মেঘের সৃষ্টি করিতেছিল। মেঘের ভিতর হইতে বিদ্যুচ্ছটা গভীর গর্জ্জনে, ফুটিয়া উঠিতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রবলবেগে বারিপাত হইতে লাগিল। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,--সে কবরের মৃত্তিকা দুই হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "দৌলত! তুমি কোথায়? এস! পালিয়ে থেকো না দৌলত! আমি ত তোমার খোঁজে এসেছি,—একি লুকোচুরি করার সময়? এস এস দৌলত! এই নৈশ আঁধারে আমাদের মহামিলন সেতু গড়ে, জীবনের সমস্ত উদ্বেগের উপশম করে ফেলি! বলিয়াই সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত তন্দ্রাভিভূতের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তাহার বাক্যস্ফুরণ যেন বন্ধ হইয়া গেল। সাহাজাদা সহসা তন্দ্রাঘোরে যেন দেখিতে পাইল, কবরের কিয়দ্দূরে একটা সুবর্ণ বেদীর উপর আসন গ্রহণ করিয়া, দৌলত, সহাস্যবদনে তাহার প্রতি অনিমেষে তাকাইয়া, অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে আহ্বান করিতেছে! সাহাজাদা উন্মত্তের ন্যায়, "দৌলত! দৌলত! আমার"--বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেইস্থানে ছুটিয়া গেল! মূর্ত্তি যেন সহসা শূন্যে মিলাইয়া গেল, সাহাজাদা সংজ্ঞা হারাইয়া সেইস্থানেই লুটাইয়া পড়িল!

ঠিক এম্‌নি সময়ে বাদসা সাহেব উদ্বেগ-আকুলচিত্তে,—লোকজন সঙ্গে করিয়া, সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের সংজ্ঞাহীন দেহ উত্তোলন করিয়া,—গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে,—বৈরম আলী, নিতান্ত অশক্ত ও অবশভাবেই,—বারান্দার একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া,—সুখ-দুঃখের পট অবস্থান্তরের মত, আলোক ও আঁধারের খেলা লইয়া,—আকাশে, চাঁদে ও মেঘে যে শক্তি পরীক্ষা চলিতেছিল,—তাহাই দেখিতেছিল। তাহার মনটা যেন ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের মতই—প্রতীয়মান হইতেছিল। পুত্র বিরহের তীব্র তুষানল, সর্ব্বক্ষণ তাহার বুকের সমস্ত শিরা ও উপশিরার মধ্যে গুরু স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া,—তাহাকে মুহ্যমান—এবং স্তব্ধ ও অনড় করিয়া তুলিয়াছিল।

ঠিক এম্‌নি সময়ে,—আমিনা,—বৈরম আলীর সম্মুখীন হইয়া,—ডাকিল "ওস্তাদজি!"

আমিনার কণ্ঠস্বরে, বৈরম আলীর একটানা ভাবনার স্রোত, বাধা পাইল। একটা নূতনতর ভাবের সংঘাতে, তাহার চিত্ত মথিত হইতে লাগিল। তাহার মুখে,—বিস্ময়ের আকারও ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সে উল্লাসহীন, উদাস হৃদয়ে, কয়েক মুহূর্ত্ত আমিনার প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া,—পুনরায় মৃত্তিকার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। একটা তাচ্ছিল্যের ভাব, তাহার চোখে মুখে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল!

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, যেন কম্পিত রুদ্ধশ্বাসে, বৈরম আলী বলিল "আমিনা! কি দেখ্তে এসেছ এতদিন পর?"

আমিনা,—বৈরম আলীর মনোভাব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিতান্ত সহজভাবে বলিল—"তুমি কেমন আছ তা'ই জান্তে এসেছি। তারপর কিছু নূতন সংবাদ তোমাকে দিব বলেই,—একাকী, এ সময় তোমার সাথে দেখা কত্তে বাধ্য হয়েছি।"

বৈরম আলী শ্লেষ-বিজড়িতকণ্ঠে বলিল "আমি কেমন আছি,—জান্তে এসেছ?—এ মন্দ অভিনয় নয়-ত!—এ কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই শোভনীয়! পুত্র বিচ্ছেদে যে অস্থির,—তা'র ভাল বলে যে কিছুই থাক্তে পারে,—এরূপ ধারণা মানুষ মাত্রেই কত্তে পারে না! এ ভাবে আমাকে পরিহাস কত্তে না আস্লেই আমি বিশেষ অনুগৃহীত হতেম। বিপদেই আত্মীয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তুমি যে এম্নিভাবে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার কর্বে,—তা'ত কোনদিনই ভাবি-নি! হোসেনের মুখের দিকে চেয়ে, তা'র ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ বিচার করে,—তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কত্তে দি'নি। তা'র প্রতিশোধ কি এম্নিভাবে নিতে হয়? তুমি যে এ. বড় স্বার্থপর ও রাক্ষসী,—তা'ত ধারণা কত্তে সক্ষম হই-নি। হোসেনের অমঙ্গল হ'লে,—তোমার কার্য্যসিদ্ধি কোনদিনই হয়ে উঠ্বে না,—এটা জেনে রেখো।"

আমিনা,—বৈরম আলীর উক্তি শ্রবণ করিয়া,—হাসিমুখে তাহার প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া, ভাবিতে লাগিল—হায়! কত বড় শোকাঘাতে, আজ এম্নিভাবে তুমি বিদ্রোহী সেজেছ,—ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছ! রাগ বলে, একটা জিনিষ যা'র কেউ, কোনদিন, অনুধাবনা কত্তে পারে-নি, আজ

তা'র কত বড় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে।—হায়! পুত্র যে কি জিনিষ, তা' একমাত্র পিতামাতাই ধারণা কত্তে পারে! আমাকে অভিমান ভরেই এত কথা বলে যাচ্ছে।—যা'র নিকট এতটা দাবী কত্তে পারে,—তা'কেই কেবল, এ ভাবে দোষারোপ করা সম্ভবপর হয়। শেষে নিতান্ত সহজভাবে আমিনা বলিল "তা' ওস্তাদজি! এ দুনিয়ার সবই স্বার্থপর। তুমিও যে স্বার্থপর নও,—তা'ও অস্বীকার করা চলে না। তুমি ক্রোধান্ধ হয়ে, আজ কত কি বলে যাচ্ছ,—এর ভিতরও স্বার্থের পূতিগন্ধ জড়িত রয়েছে! হোসেনের মঙ্গলের উপর আমার কার্য্যোদ্ধারের পথ যে বিস্তৃত আছে বল্‌ছ,—তা' আমি মনেও স্থান দিতে চাই না। তবে আমার মনে হয়—স্ত্রীলোক রাক্ষসী হলেও, স্নেহের বন্ধনে গলে যায়—তারাই। তারাই তোমাদের সুখ-শান্তির পূর্ণ ভাণ্ডার উন্মোচন করে দিচ্ছে!"

বৈরম আলী উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল "আমিনা! স্ত্রীলোক চিরদিনই মায়াবিনী। এরা না কত্তে পারে,—এরূপ কোন কাজ নেই। হোসেনকে জোর করে কেড়ে নেওয়ার ভিতর, তুমিও যে একজন ষড়যন্ত্রকারী, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি! তুমি তা'ই এতদিন পালিয়ে—লুকোচুরী খেল্‌ছিলে!"

আমিনা নিতান্ত সহজভাবে, সহাস্যবদনে বলিল "আমি এতদিন কোথায় ছিলুম,—কি করেছি,—তা'র হিসাব তোমাকে দিব বলেই, তোমার নিকট এসেছিলুম। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে,—তা' হ'তে বিরত হ'তে বাধ্য হলেম। আচ্ছা ওস্তাদজি! তুমি হোসেনের বিরহে ম্রিয়মান হয়েছ,—তা'র উদ্ধারের জন্য কি প্রতিকার করেছ,—বল্‌তে পার কি আমাকে?"

বৈরম আলী দৃঢ়স্বরে বলিল "কি প্রতিকার আমি কত্তে পারি? প্রবল শক্তির নিকট আমার চেষ্টা ও উদ্যোগ নিতান্ত ব্যর্থ করে দিত-ই। তাই একাকী বসে, চোখের জলে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। উপায় যে নেই—!"

আমিনা এইবার দর্পিতা সিংহীর মত সতেজে বলিল "সে—কি বল্‌ছ ওস্তাদজি! তুমি পুরুষ,—তোমার শক্তি, সাহস অপ্রতিহত! একটা স্ত্রীলোক যা' কত্তে সক্ষম হয়,—তা'ও তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর হ'তে না পার্‌লে,—আমাদের পক্ষে তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করা, বিড়ম্বনা মাত্র! পুরুষ যা'রা—তা'রা বিপদে ধৈর্য্যহারা হয় না,—উদ্ধারের পথ বের কত্তে,—প্রাণপাত কত্তে অগ্রসর হয়! কৈ তুমি-ত সেরূপ কিছু কর-নি,—অথচ শ্লেষ-বিজড়িতকণ্ঠে আমাকে কত কি বলে যাচ্ছ! তা' তোমার দোষ দি'নি,—সাধারণতঃ সকলে যেরূপ করে থাকে, তুমি তা'র বেশী কিছু কর-নি। তবে স্ত্রীলোক-দিগকে,—একেবারে নগণ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেও না—ওস্তাদজি!"

আমিনার কথার ঝাঁজে, বৈরম আলীর জ্বলন্ত কোপ সহসা কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। শেষে নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় আমিনার সম্মুখীন হইয়া বলিল "আমিনা! বল ঠিক করে, হোসেন আমার বেঁচে আছে-ত? এ একটি মাত্র সঠিক উত্তরের আশায় আমার দিন কেটে যাচ্ছে। যে দিন তা'র অমঙ্গল সংবাদ আমার কাণে পৌঁছিবে,—সেদিন আমার অস্তিত্ব পৃথিবী হ'তে লোপ পেয়ে যাবে। বল আমিনা! ঠিক করে বল, আমার হোসেন কোথায়?"—বলিয়াই বৈরম আলী নিতান্ত অসহায়ের ন্যায়, ভূমিতে উপুড় হইয়া লুটাইয়া,—বালকের ন্যায়,—ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার সেই বিলাপ উক্তি—নিতান্তই অসহনীয় ও মর্ম্মন্তুদ!—আমিনার মন

দমিয়া গেল,—সে আর স্থির থাকিতে পারিল না,—ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, আমিনা,—বৈরম আলীকে মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিল এবং শরীরের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া,—মৃদুকণ্ঠে বলিল" ওস্তাদজি! তুমি উতলা হয়ো না,—হোসেন আমার বেঁচে আছে। তা'কে রক্ষা কত্তেই, আমি এতদিন আপনাকে নানা বিপদে জড়িত কত্তে বাধ্য হয়েছিলুম,—তা'ই তোমার সাথে দেখা কত্তে পারি-নি। কারাগার হ'তে মুক্তি পেয়েই—তোমার নিকট ছুটে এসেছি।"

বৈরম আলী—উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল "আমিনা! আমাকে ক্ষমা কর। আমি একরকম পাগল বনে গেছি,—তোমাকে কি বল্তে কি বলেছি, তা'ত আমার হিসাব কর্বার অত ক্ষমতা ছিল না।—বল—সমস্ত বিষয় আমাকে খুলে বল।"

অতঃপর আমিনা আর কোন বাক্যাড়ম্বর না করিয়া, অতি সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় বৈরম আলীর নিকট বিবৃত করিল। বৈরম আলী মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সমস্ত শ্রবণ করিয়া,—আমিনার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল "আমিনা! তুমি হোসেনের মা। তা'র জননী বেঁচে থাক্‌লেও,—তা'র জন্য এতটা কত্তে পাত্ত না। আমি অযথা কতগুলি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে তোমার মর্ম্মে আঘাত করেছি,—আমাকে ক্ষমা কর।—ক্ষমা কর্বে না, আমিনা?"

আমিনা—কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "ওস্তাদজি! আমার কর্ত্তব্য কাজ,—আমি করেছি। হোসেন যেদিন আমাকে মা বলে সম্বোধন করেছিল,—সে দিনই আমি আত্মহারা হয়ে,—পুত্র বলে তা'কে গ্রহণ করেছিলুম। তা'র রক্ষার জন্য আমি যেটুকুন কত্তে সক্ষম হয়েছি,—সে সমস্ত সেই খোদার প্রেরণায়ই অনুপ্রাণিত হয়েছিলুম। কোন কার্য্যোদ্ধারের আশায় আজ আমি তোমার নিকট আসি-নি।

আশীর্ব্বাদ কর,—তোমাদের বিপদে আপদে যেন আমি সর্ব্বদাই—প্রাণপাত কত্তে সক্ষম হই। এ একমাত্র আশা নিয়ে জীবন ধারণ কত্তে চাইছি,—এর বেশী আর কোন আকাঙ্ক্ষা আমার নেই,—এখন আমি বিদায় চাই।”

বৈরম আলী ধীরে ধীরে আমিনার হস্ত ধারণ করিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। শেষে আমিনার হস্তদ্বয় স্বীয় হস্তে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া বলিল “আমিনা! তুমি যা’ করেছ--তা’র প্রতিদান দিবার ক্ষমতা আমার নেই,—আমি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রের দান,—সেই অসীম কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণীয় হ’তে পারে না! যে আশঙ্কায় আমি এতদিন তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ কত্তে চাই-নি,—সেটা যে একটা ভ্রান্তিমূলক প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই নয়,—তা’ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। আজ হ’তে আমি তোমাকে হোসেনের মা বলেই গ্রহণ করলেম। আজ হ’তে তুমি আমার হয়ে,—আমার ক্ষুদ্র গৃহ আলো করে থাক।”

সহসা আমিনার নেত্র অশ্রু-সজল হইয়া আসিল। আমিনা অশ্রুজড়িতকণ্ঠে বলিল “ওস্তাদজি! আমাকে ক্ষমা কর,—তা’ আমি হ’তে দোব না।”

বৈরম আলী কথায় বাধা দিয়া, আমিনাকে তাহার বক্ষে টানিয়া আনিয়া, আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিল। আমিনা—অনেকবার “তা হবে না”—কথা কয়টি উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিল,—কিন্তু শব্দগুলি ফুটাইয়া তুলিতে পারিল না। আমিনা শেষে মুদ্রিত নেত্রে,—বৈরম আলীর বক্ষে তাহার মস্তক নোয়াইয়া, সমস্ত দেহ ভার সংন্যস্ত করিল। একটা অসীম সুখ-হিল্লোলে—তাহার ক্ষুধার্ত্ত চিত্ত,—উদ্বেলিত হইয়া গেল!

উপসংহার।

ইহার পর আরও তিনটি মাস কাটিয়া গেল। বাদসা সাহেব,—অশেষ গুণসম্পন্না, সুন্দরী রমণীরত্ন সংগ্রহ করিয়া, সাহাজাদার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন,—কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান, কার্য্যে পরিণত করাইতে পারিলেন না। সাহাজাদা, আজীবন অবিবাহিত থাকিবে, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। বাদসা সাহেব নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও যখন পুত্রের মত পরিবর্ত্তন করাইতে পারিলেন না,—তখন তিনি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া,—এক শুভলগ্নে,—মতিয়া ও হোসেনের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া ফেলিলেন।

বিবাহ রাত্রিতে, শুভ মিলন-ক্ষণে,—মতিয়া,—হোসেন আলীর সামান্য ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, ব্যগ্রতাতিশয্যে প্রশ্ন করিল—"প্রিয়তম! আজ তোমাকে এমন উন্মনা দেখাচ্ছে কেন,—তা' আমাকে বল্‌বে না।"

হোসেন আলী, স্মিতমুখে—মৃদুকণ্ঠে বলিল "তা' কিচ্ছু নয় মতিয়া! একটা বিষয় ভাব্‌ছিলুম।"

মতিয়া দুই হস্তে স্বামীর গলা জড়াইয়া,—তাহার মস্তক, বক্ষে টানিয়া আনিয়া, সোহাগ জড়িতকণ্ঠে বলিল "কি ভাব্‌ছিলে—আমাকে বল্‌বে না? আমার যে শুন্‌তে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে।"

হোসেন আলী সামান্য ইতস্ততঃ করিয়া,—শেষে সহজভাবে বলিল "সেদিন ঘাতকের তরবারি দেখে,—বিবাহের সাপক্ষে-ত মত দিয়েছিলে। যদি কাজী সাহেব, মধ্যবর্ত্তী হয়ে, সমস্ত বিষয় প্রকাশ কত্তে অবকাশ না পেতেন,—তবে আজ তুমি...... ."

কথা শেষ না হইতেই,—মতিয়া,—দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল।—শেষে চক্ষু ঘুরাইয়া, একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া,—তীব্রকণ্ঠে বলিল "তা'—বুঝি?—আসল কথা যে কি—জান? যখন তোমাকে রক্ষা কর্‌বার আর কোন উপায়ই থাক্‌ল না,—তখনই-না—মত দিয়ে, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার পন্থা বের করে নিলুম! তারপর কি কত্তুম—জান?" বলিয়া মতিয়া তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে, দক্ষিণ হস্তে, একখানা ছোট তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া,—সতেজে বলিতে লাগিল—"বিবাহ কার্য্য সমাধার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত,—তোমাকে পাবার আশা ছাড়তুম না। শেষে যখন অব্যাহতি লাভের আর কোন উপায়ই দেখ্‌তুম না,—তখন এই ছুরি, বক্ষে বসিয়ে দিয়ে,—পরপারে যেয়েই,—তোমার অপেক্ষা কত্তুম,—বুঝ্‌লে? আমরা চিরদিনই পুরুষদের ক্রীড়নক হয়ে আছি,—এ অবস্থায় এ হচ্ছে আমাদের জীবন-সুহৃদ্! প্রত্যেক নারী যদি, এ বান্ধবকে সাথী কত্ত,—তবে আমরা এম্‌নি নির্দ্দয়ভাবে, স্বেচ্ছাচারী পুরুষের হস্তে—আত্মসমর্পণ করে, নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় নিষ্পেষিত হ'তে পাত্তুম না।" বলিয়া মতিয়া ছুরিখানা, বস্ত্রের আড়ালে,—ক্ষুদ্র খাপে, লুকাইয়া রাখিল। শেষে এক গাল হাসিয়া, স্বামীর গলা জড়াইয়া, তাহার বক্ষে মস্তক লুটাইয়া দিল!

হোসেন আলী নীরবে মতিয়ার সমস্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া,—একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল! শেষে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া

বলিল—"মতিয়া! তুমিই নারী-রত্ন,—তোমাকে লাভ করে আমি খুবই গর্ব্ব অনুভব কচ্ছি।"

পর মুহূর্ত্তে,—হোসেন আলী, আবেশ-মথিত-চিত্তে, মতিয়াকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া,—তাহার তৃষিত চিত্তে, শান্তি-সুধা-প্রলেপ বুলাইয়া দিল!

ইহার পর আরও তিনটি মাস কাটিয়া গেল,—সাহাজাদার মনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। বাদসা সাহেব একমাত্র পুত্রের বৈরাগ্য ভাব লক্ষ্য করিয়া একেবারে দমিয়া গেলেন এবং নানা চিন্তায় আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল। শেষে একদিন হঠাৎ—সন্ন্যাস রোগে,—জীবনলীলা শেষ করিয়া,—সমস্ত অশান্তির অবসান করিলেন!

বাদসার মৃত্যুর পর,—সাহাজাদা রাজ্যভার গ্রহণ করিল সত্য, কিন্তু সমস্ত রাজকীয় কার্য্য পরিচালনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কাজী সাহেবের উপর ন্যস্ত করিয়া, নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল! সাহাজাদা,—স্বীয় তত্ত্বাবধানে,—দৌলতের কবরের উপর, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও তৎপার্শ্বে একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইল, এবং বিশেষ সমারোহের সহিত, অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার উৎসব, সুসম্পন্ন করাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, একটি শুভদিন ধার্য্য করিল।

আজ উৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছে। ভোর হইতেই বহু দীন-দরিদ্রের সমাগম হইয়াছে। সকলেই আশাতীত দান লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া, চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। একটা প্রাণ মাতান ভাবের সংঘাতে, সকলেই আজ উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইতেই সাহাজাদা মুক্তহস্তে সকলকেই ধন অর্থ, বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করিতে লাগিল। সকলেই নানাবিধ আহারীয় দ্বারা উদর পূরণ করিয়া, অসীম

তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল! এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বেলা চারিটার সময়, সাহাজাদা,—স্মৃতি-মন্দিরের আভ্যন্তরীন্, কবরের উপর সুনির্ম্মিত বেদীর একপার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিল। দৌলতের ছবিখানি অন্তরের অন্তস্থলে অঙ্কিত করিয়া,—তদ্গত-চিত্তে, অতীত ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিল। ঠিক এম্‌নি সময়ে হোসেন আলী, মতিয়াকে সঙ্গে করিয়া, সাহাজাদার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহাজাদা তাহাদিগকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া,—আসন পরিত্যাগ করিল এবং নতমুখে তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মতিয়া উদ্বেলিত আগ্রহে সাহাজাদার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "ভাই সাহেব! দৌলত চিরদিনের মতই চলে গেছে,—শত চেষ্টায়ও আর তা'কে ফিরে পাবার উপাই নেই। আপনি এই জ্বালাভরা স্মৃতির অনল বুকে করে, এম্‌নি ভাবে, মহামূল্য জীবনটা নষ্ট কর্‌বেন না! আপনার একান্ত আগ্রহে ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, এই শুভ উৎসব অনুষ্ঠান, সুচারুরূপেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। আপনি সে সমস্ত স্মৃতি—মন হ'তে মুছে ফেলে, এখন সংসারী হ'ন,—রাজ্য পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে, প্রজাগণের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করুন। দৌলত, শত্রুর মতই কাজ করে গেছে,—তা'র মৃত্যু সে স্বইচ্ছায়ই বরণ করেছিল,—তা'র অপরিণামদর্শিতার ফল ভোগ কত্তে গিয়ে—আপনি এম্‌নিভাবে, অশান্তি-ইন্ধনে আপনাকে দগ্ধ কর্‌বেন না,—এই আমাদের শেষ অনুরোধ!"

সাহাজাদা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একটা জ্বালাময় স্মৃতির তাড়নায় তাহার শীর্ণমুখে, কালিমালিপ্ত দুই চোখের তারা,—একটা অস্বাভাবিক তেজে দীপ্তিমান্ হইয়া গেল। সে কঠোর ব্যঙ্গে আপনাকে আপনিই অভিনন্দিত করিয়া—অশ্রুজড়িতকণ্ঠে বলিল "মতিয়া! বোন্—আমার! দৌলতের স্মৃতি মুছে ফেল্‌তে বল্‌ছ?

তা'ত হবার উপায় নেই,—এই স্মৃতিটুকুই এখন আমার অভিশপ্ত জীবনের মূল্যবান সম্পত্তি, জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন! দৌলতকে ভুল্তে চেষ্টা করব? তা'ত এ জীবন থাক্‌তে হবে না,—এত বড় অবিচারের প্রশ্রয়-ত কখনও দিতে পার্‌ব না! দৌলত যে আমার অন্তরের কতটুকু স্থান অধিকার করে বসেছিল, তা'ত সৌন্দর্য্যমোহের ছলনায়, আমি ময় থাক্‌তে বুঝতে পারি-নি। কতটুকু অভিমানের সংঘাতে, এবং চির বিচ্ছেদের আশঙ্কায়—সে আত্মঘাতী হয়েছে, তা' যখনই চিন্তা করি, তখনই আমার অন্তর শতধা হয়ে ছিন্ন হ'তে চায়! সঙ্গে সঙ্গে তা'রই মত, মৃত্যু-বরণ করে, তা'র নিকট ছুটে যাবার প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠে! দৌলত-ত শত্রুর মত কোন কাজ করে-নি আমার সাথে,—সে খাঁটি তাটুকুন জগতে প্রচার করে গেছে! সে মৃত্যু বরণ করে জানিয়ে দিয়ে গেছে, ভালবাসার পবিত্র স্মৃতি—সৌন্দর্য্যের ক্ষণিক মোহের তুলনায়,—কত বৃহৎ, কত পবিত্র, কত সুন্দর! তা'র সংঘাতে মানুষ আপনাকে উচ্চ স্তরে টেনে নিতে সক্ষম হয়। সে জানিয়ে গেছে,—স্ত্রীলোক পুরুষের খেলার পুতুল নয়,—ইচ্ছামত ভেঙ্গে চুরমার করে দিবার সামগ্রীও নয়! তা'কে যে ভাবে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি,—অবজ্ঞাভরে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করেছি, তা'র তুলনায় আত্মহত্যার স্পৃহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তা'র মৃত্যু না ঘটায়ে, খোদা যদি আমার সাথে তা'র মিলনের ব্যবস্থা করে দিতেন, তবে আমার ঘৃণিত অনুষ্ঠানের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হ'ত না,—এম্‌নিভাবে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বারও উন্মুক্ত পথ আমার নিকট আত্মপ্রসারণ কর্‌ত না। যতদিন জীবনধারণ কর্‌ব, ততদিন খোদার দেওয়া শাস্তি, বিধিলিপির মতই মস্তকে ধারণ করে, জগতবাসীকে জানিয়ে দোব,—পবিত্র প্রণয় বন্ধন, ক্ষণিক সৌন্দর্য্য মোহের সংঘাতে ছিন্ন কর্‌তে চাইলে,—এম্‌নি অভাবনীয় শাস্তির ধারাগুলি মস্তক

পেতে নিতে হবে,--ইহাই খোদার একান্ত ইচ্ছা। আমাকে সংসারী হ'বার কথা বল্‌ছ,--তা'ত এ জীবনে হবার উপায় নেই! দৌলতকে পাবার আশা-ত নেই,—মৃত্যুর পরে যা'তে, দৌলত আমার হয়, সে প্রতীক্ষায় বসে থাক্‌ব। জানি না খোদা--আমার কামনা পূর্ণ কর্‌বেন কি না।"

সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া,—ধীরে ধীরে মতিয়া ও হোসেন আলীর হস্তদ্বয় দুই হাতে ধারণ করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল "মতিয়া বোন্!—হোসেন ভাই! আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে, বল, রক্ষা কর্‌বে?"

মতিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "কি কর্‌তে হবে বলুন,—তারপর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি!"

সাহাজাদা—জড়িতকণ্ঠে বলিল "বোন্!" প্রতিশ্রুতি দাও, তবেই আমার নিবেদন জ্ঞাপন কর্‌ব। যদি তোমরা আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর, তবে বুঝ্‌ব, আমার পবিত্র-ব্রতে তোমাদের সহানুভূতি নেই। আমার খামখেয়ালীর জন্য হোসেন ভাই, বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, তজ্জন্য আমি লজ্জিত! যদি তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, তবে বুঝ্‌ব,—তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।"

হোসেন আলী ও মতিয়া কয়েক মিনিট নীরবে থাকিয়া অগত্যা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

সাহাজাদা তাহার পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া হোসেন আলীর হস্তে প্রদান করিল এবং দৃঢ়স্বরে বলিল "হোসেন ভাই! এ' হল আমার দানপত্র,—আমার রাজ্য, তোমাকে লিখে দিলুম,—আজ হ'তে, তুমি এ রাজ্যের বাদসা। দীর্ঘজীবন লাভ করে, মতিয়াকে নিয়ে, সুখে বসত বাস কর, তজ্জন্য খোদার দোয়া প্রার্থনা কচ্ছি।"

মতিয়া ও হোসেন—সাহাজাদার উক্তিতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এত বড় ত্যাগ স্বীকার করিতে যে মানুষ পারে,--তাহা তাহাদের ধারণার অতীত ছিল!

তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া সাহাজাদা দৃঢ়স্বরে বলিল "ভাই হোসেন! আমার দৌলতের অতিথিশালা পরিচালনের জন্য প্রতি মাসে আমাকে সহস্র মুদ্রা দান করো, এ প্রার্থনাও দানপত্রে লিখে দিয়েছি। কোন আপত্তি করো না, রাজ্যভার গ্রহণ করে, প্রজা পালন কর,—এতেই আমি তৃপ্ত হব।"

প্রায় পনর মিনিট কাল নীরবে থাকিয়া, মতিয়া, নম্রকণ্ঠে বলিল "ভাই সাহেব! আমারও একটা অনুরোধ রয়েছে, তা'ও আপনাকে প্রতিপালন কত্তে হ'বে! আপনি প্রতিশ্রুতি দিলে আমি ব্যক্ত কত্তে পারি।"

সাহাজাদা মতিয়ার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল "বোন্! তুমি কি অনুরোধ কর্‌বে তা' অনেকটা বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে বিবাহ কত্তে অনুরোধ কত্তে চাইছ। আমার অনুমান যদি সত্য হয়,—তবে আমি বল্‌ছি,--বোন্ আমার,--তোমার এই একটী মাত্র অনুরোধ আমি রক্ষা কত্তে অক্ষম। দৌলতের এই কবরের পার্শ্বে পড়ে থেকে, আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সমাধান কর্‌ব, এই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। মতিয়া! বোন্ আমার,--আমিই দৌলতকে হত্যা করেছি, আমি তাকে এমনি ভাবে প্রত্যাখ্যান না কর্‌লে, দৌলত কোন দিনই আত্মহত্যা কর্‌ত না। হায়! আমার দৌলত নেই! আশৈশব যাকে সাথী করে নিয়ে, কত ভবিষ্যৎ সুখ-কল্পনায় বিভোর হয়ে বাল্যজীবন কাটিয়েছি, নিজের ভুলে, যাত্রাপথেই, আমি তাকে চির জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি! আমার দৌলত এই কবরে রয়েছে,—কবরেই মাটি হয়ে

গেছে! মাটির সাথে তা'র দেহের অণুপরমাণু মিশে গেছে! সেই সুগোল, সুঠাম দেহ আজ মাটি হয়ে গেছে? দৌলত! আমার দৌলত! কোথায় তুমি আজ?" বলিতে বলিতে সাহাজাদা—দৌলতের কবরের প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপরে লুটাইয়া পড়িল: সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারাইয়া ফেলিল!

মতিয়া ত্বরিতপদে ছুটিয়া যাইয়া, সাহাজাদার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিল, এবং নাকে চোখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। হোসেন আলী ব্যস্ত সহকারে নতজানু হইয়া,—তাহার পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিল।

এদিকে বাহিরের সমবেত জনসঙ্ঘ,—উৎসব আমোদে মত্ত হইয়া, প্রাণ মাতান সুরে—চারিদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিল! শোক ও আনন্দের-উৎস,—বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন স্থানে,—প্রবাহিত হইতে লাগিল।

